৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

লেকচার: ১০

টপিক:

সমস্যা সমাধান–১: দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক, Land Boundary, অর্থনৈতিক ও গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি। (বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি, ভারত- বাংলাদেশ-আমেরিকা- চীন সম্পর্ক, আই এফ এম ঋণ, ইউক্রেন- রাশিয়া ইস্যু, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ।)

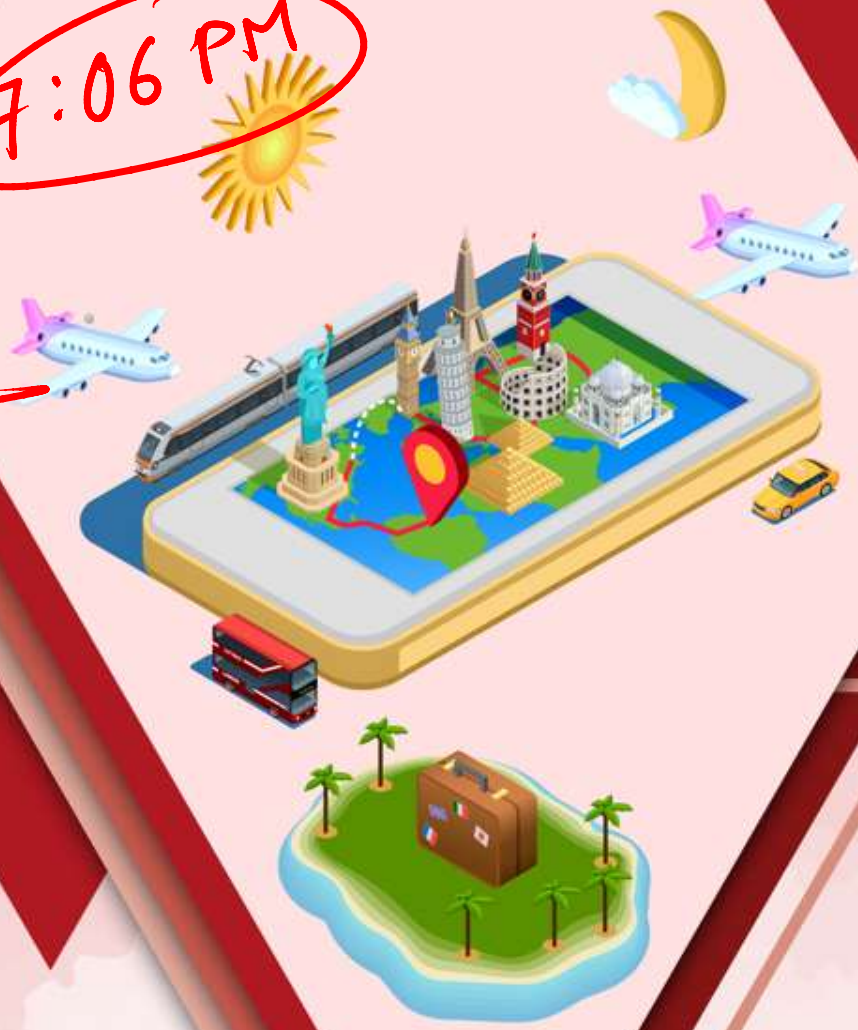

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

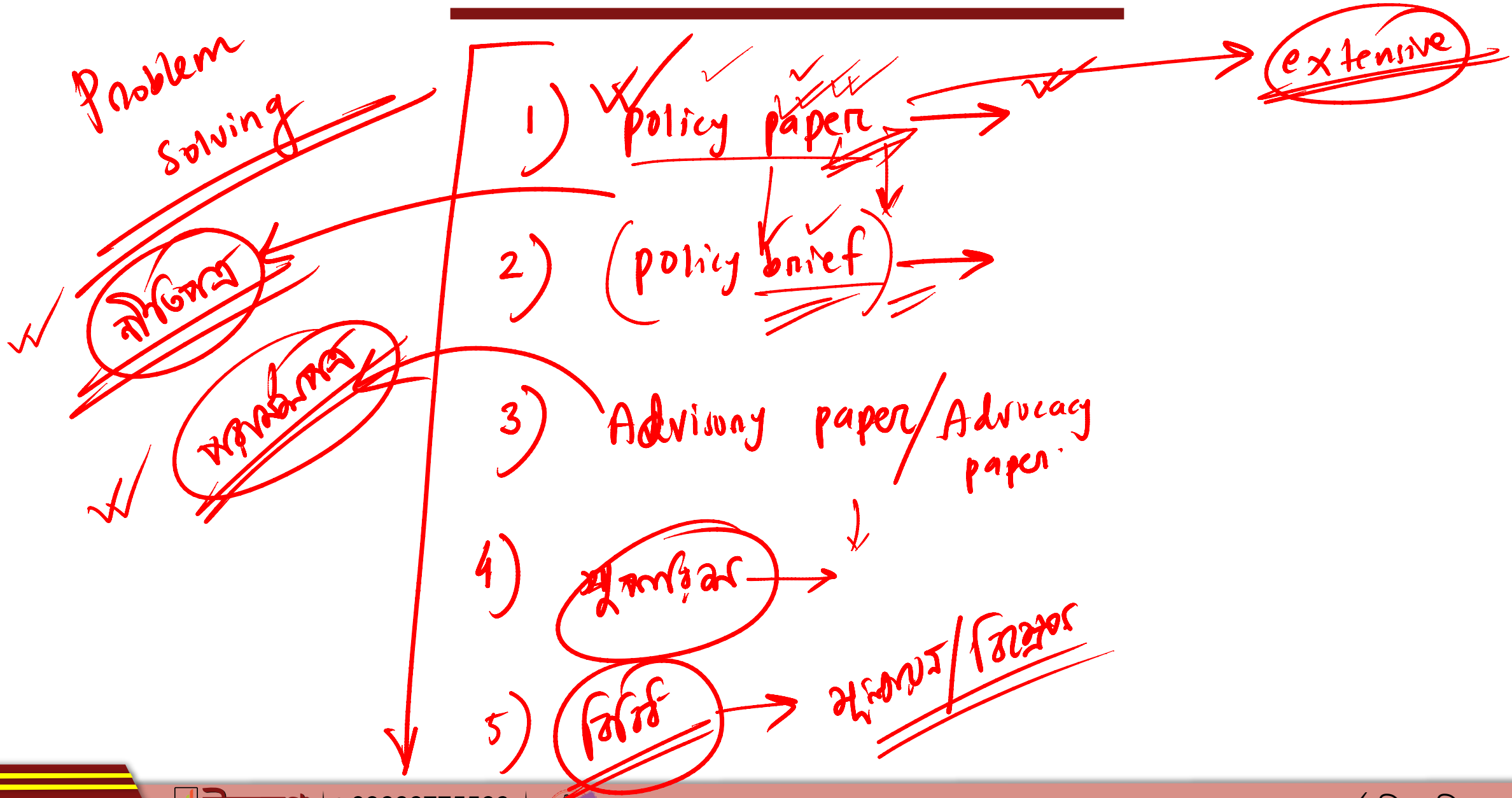
Problem Solving
নীতিপত্র
অবস্থানপত্র
1) Policy paper
extensive
2) policy brief
3) Advisory paper/Advocacy paper
4)
5)

PROBLEM SOLVING ও POLICY BRIEF (নীতিপত্র) এর জন্য অনুসরণীয়

Problem Solving (সমস্যা সমাধান)			Policy Brief (নীতিপত্র)		
Problem Solving উত্তর করার সময় ৬টি বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে -			Policy Brief উত্তর করার সময় ৮টি বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে -		
প্রথম অংশ	:	ভূমিকা	প্রথম অংশ	:	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
দ্বিতীয় অংশ	:	সমস্যার প্রেক্ষাপট	দ্বিতীয় অংশ	:	স্মারক নং ও তারিখ
তৃতীয় অংশ	:	সমস্যার বর্তমান পরিস্থিতি	তৃতীয় অংশ	:	সমস্যার শিরোনাম
চতুর্থ অংশ	:	সমস্যার প্রভাব	চতুর্থ অংশ	:	ভূমিকা
পঞ্চম অংশ	:	সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশ	পঞ্চম অংশ	:	সমস্যার প্রেক্ষাপট
ষষ্ঠ অংশ	:	International Reference	ষষ্ঠ অংশ	:	সমস্যার প্রভাব
			সপ্তম অংশ	:	সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশ
			অষ্টম অংশ	:	International Reference

PROBLEM SOLVING ও POLICY BRIEF (নীতিপত্র) এর জন্য অনুসরণীয়

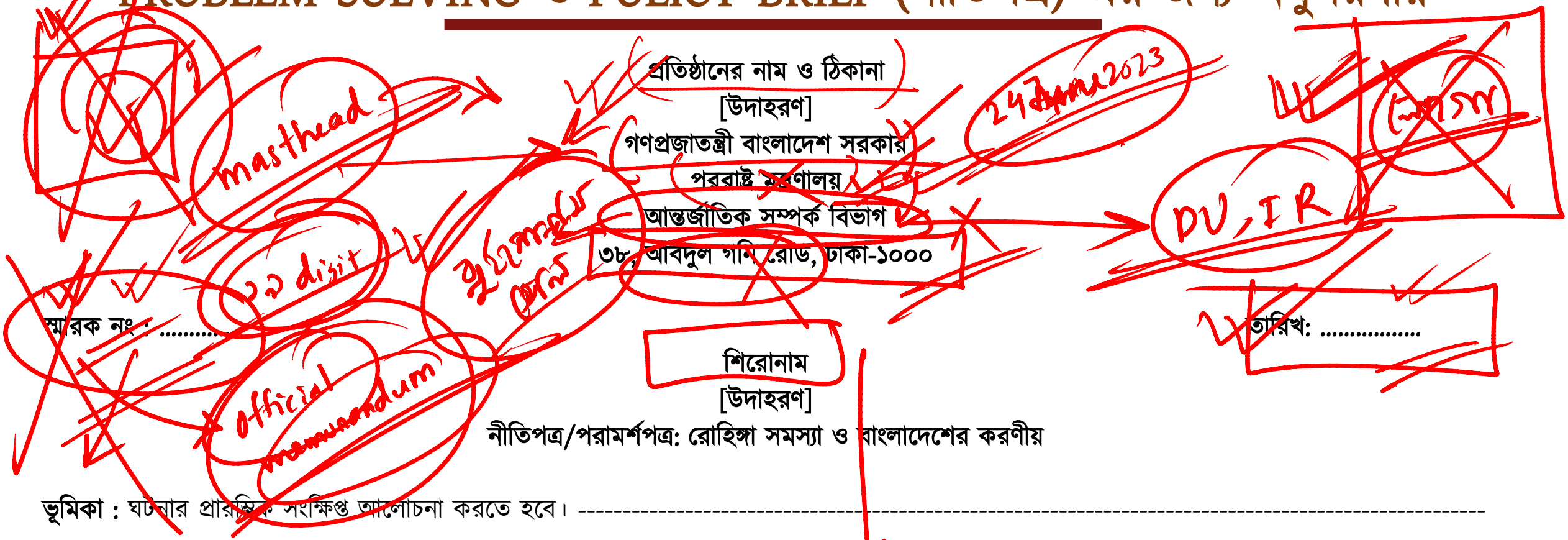

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
[উদাহরণ]
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
৩৮, আবদুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০

স্মারক নং: .....

তারিখ: .....

শিরোনাম
[উদাহরণ]
নীতিপত্র/পরামর্শপত্র: রোহিঙ্গা সমস্যা ও বাংলাদেশের করণীয়

ভূমিকা : ঘটনার প্রারম্ভিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে হবে। ----------
---

সমস্যার প্রেক্ষাপট : শুরু থেকে বর্তমান পরিস্থিতি পর্যন্ত ঘটনার ধারাবাহিকতা তুলে ধরতে হবে। ----------
---

PROBLEM SOLVING ও POLICY BRIEF (নীতিপত্র) এর জন্য অনুসরণীয়

সমস্যার প্রভাব : ----------

সম্ভাব্য সমাধান/সুপারিশ : ----------

উপসংহার : ----------

আন্তর্জাতিক রেফারেন্স :

১. ----------
২. ----------
৩. ----------

[একটি পলিসি ব্রিফ অন্তত তিন থেকে চার পৃষ্ঠা লিখুন।]

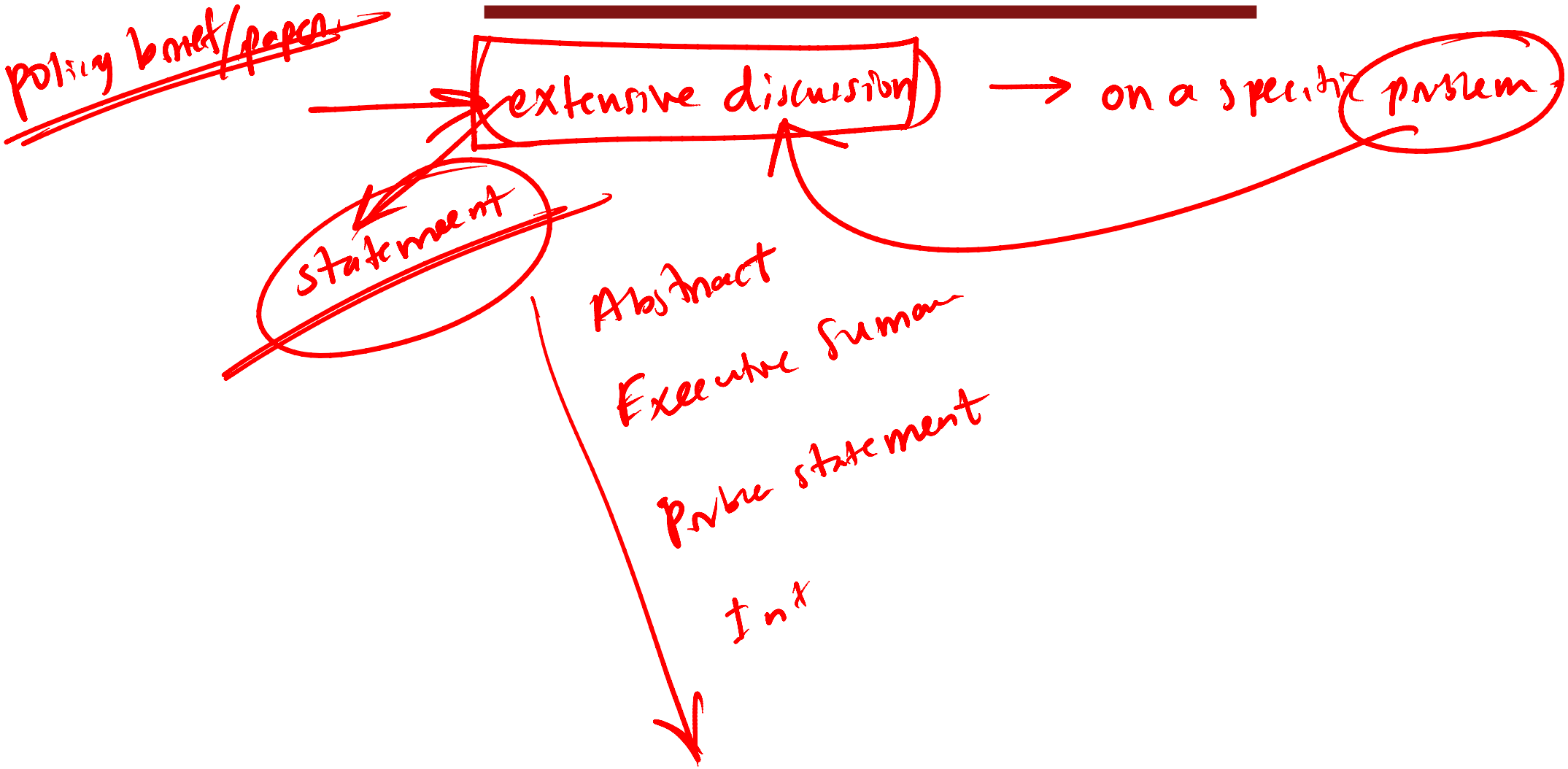

policy brief/paper
extensive discussion
→ on a specific problem
statement
Abstract
Executive Summary
Problem statement
Int

15

masthead → Slide

1) Title (শিরোনাম) → single line

2) Problem statement → 2/3 line

3) Background / পটভূমি → (Introduction)

4) মূল অংশ: (Main Body)

5) সুপারিশমালা (Recommendation) → i), ii), iii), iv), v)

6) Obstacle/Challenge

7) সারাংশ → Summarized

8) Conclusion

9) Reference

STP, LTP

Short term plan

Long term plan

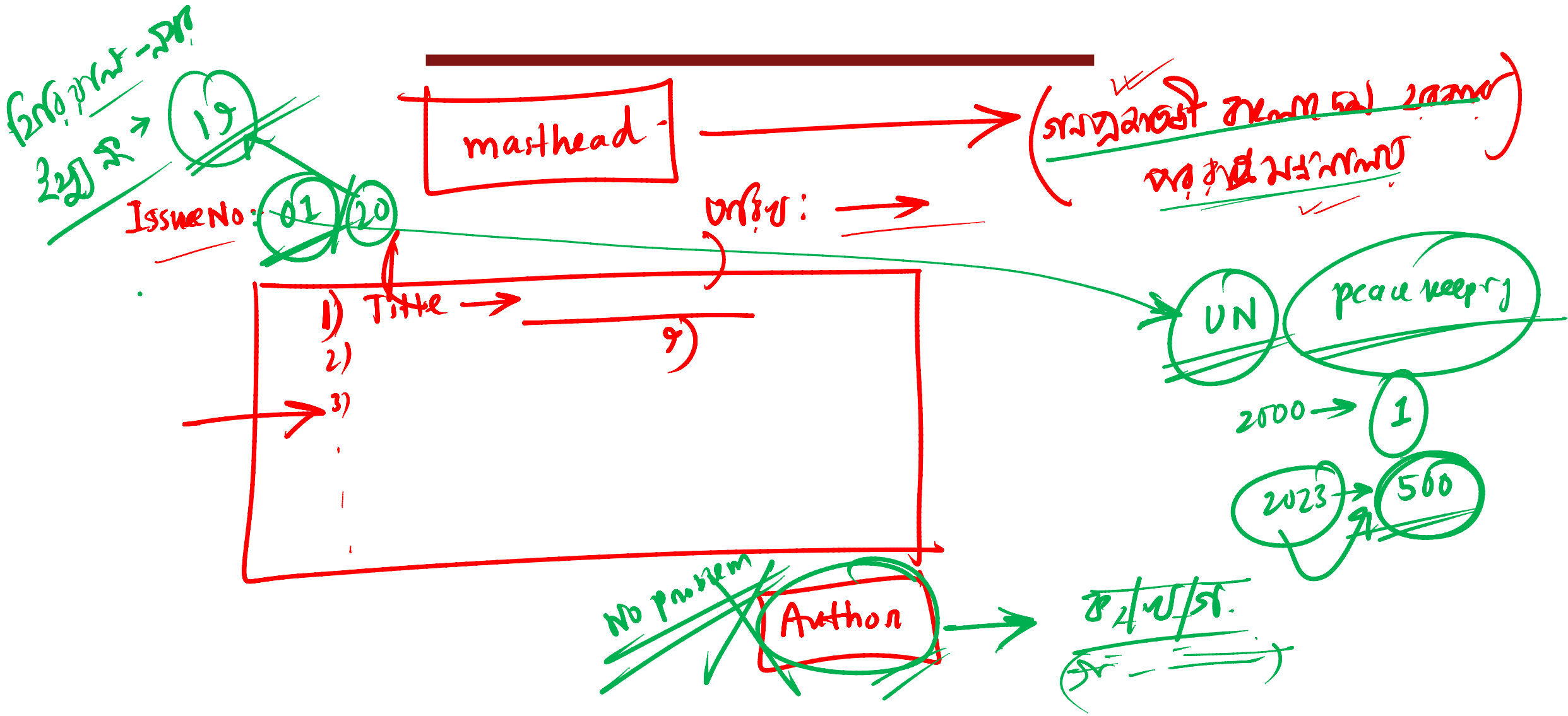

masthead
Issue No: 01/20
তারিখ:
1) Title
2)
3)
Author
No problem
UN
peace keeping
2000
1
2023
500

5-min break
3)
graph / chart / Map / Diag…
pie chart / block diagram
3) Background

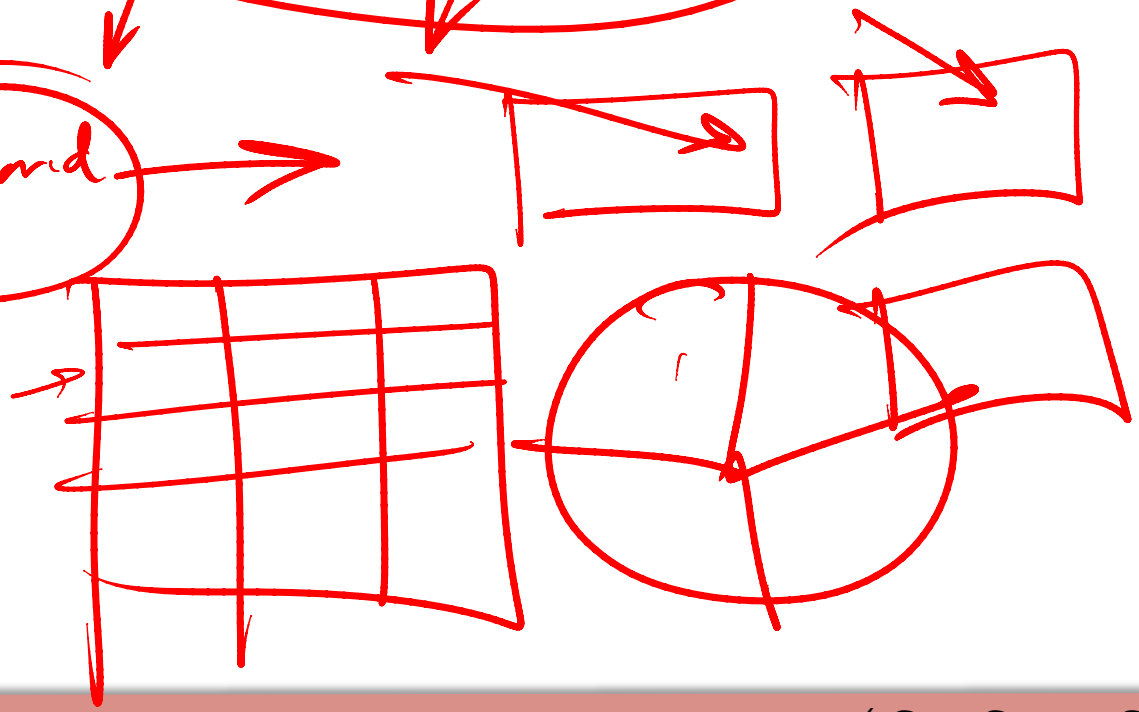

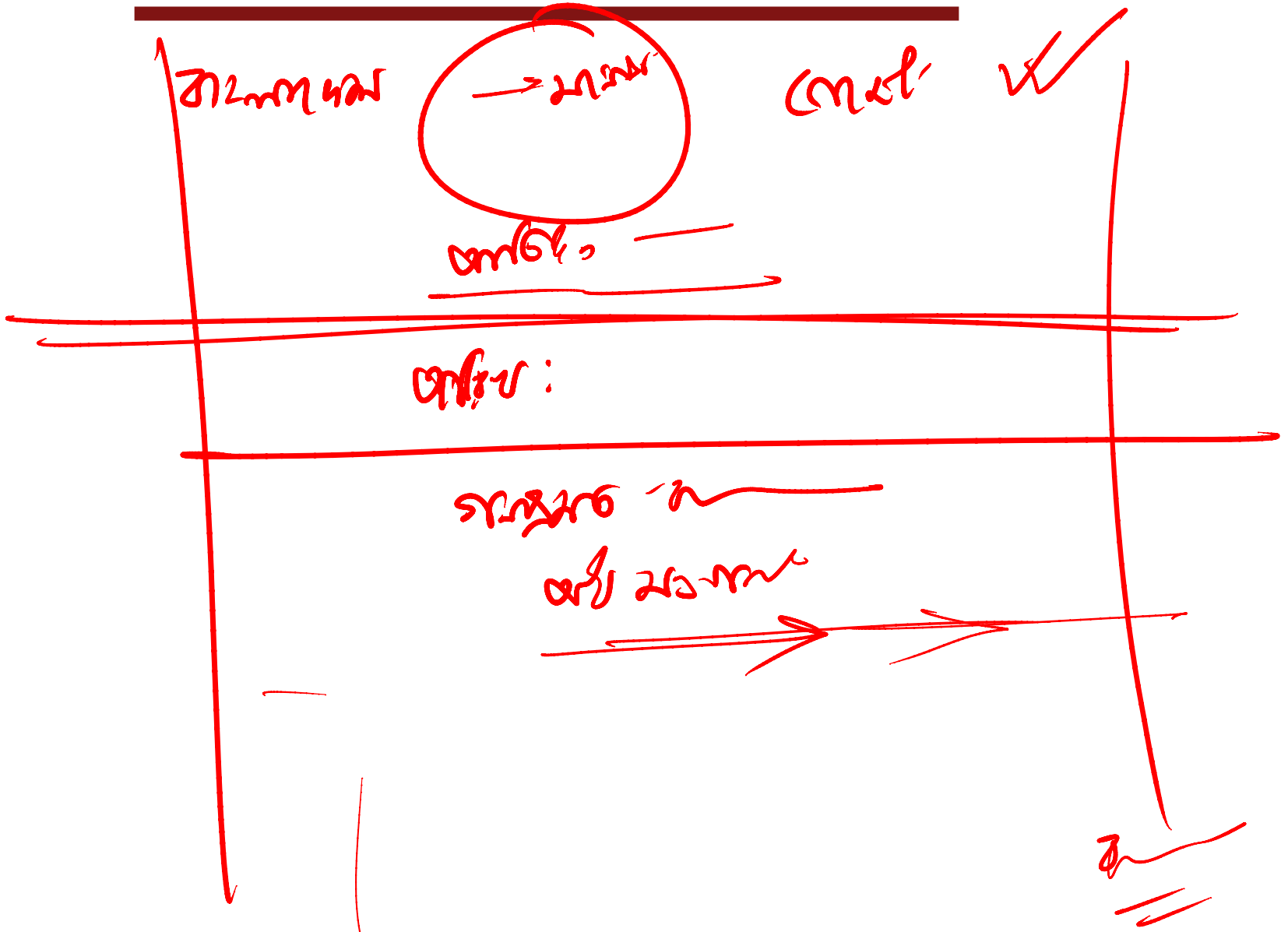

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

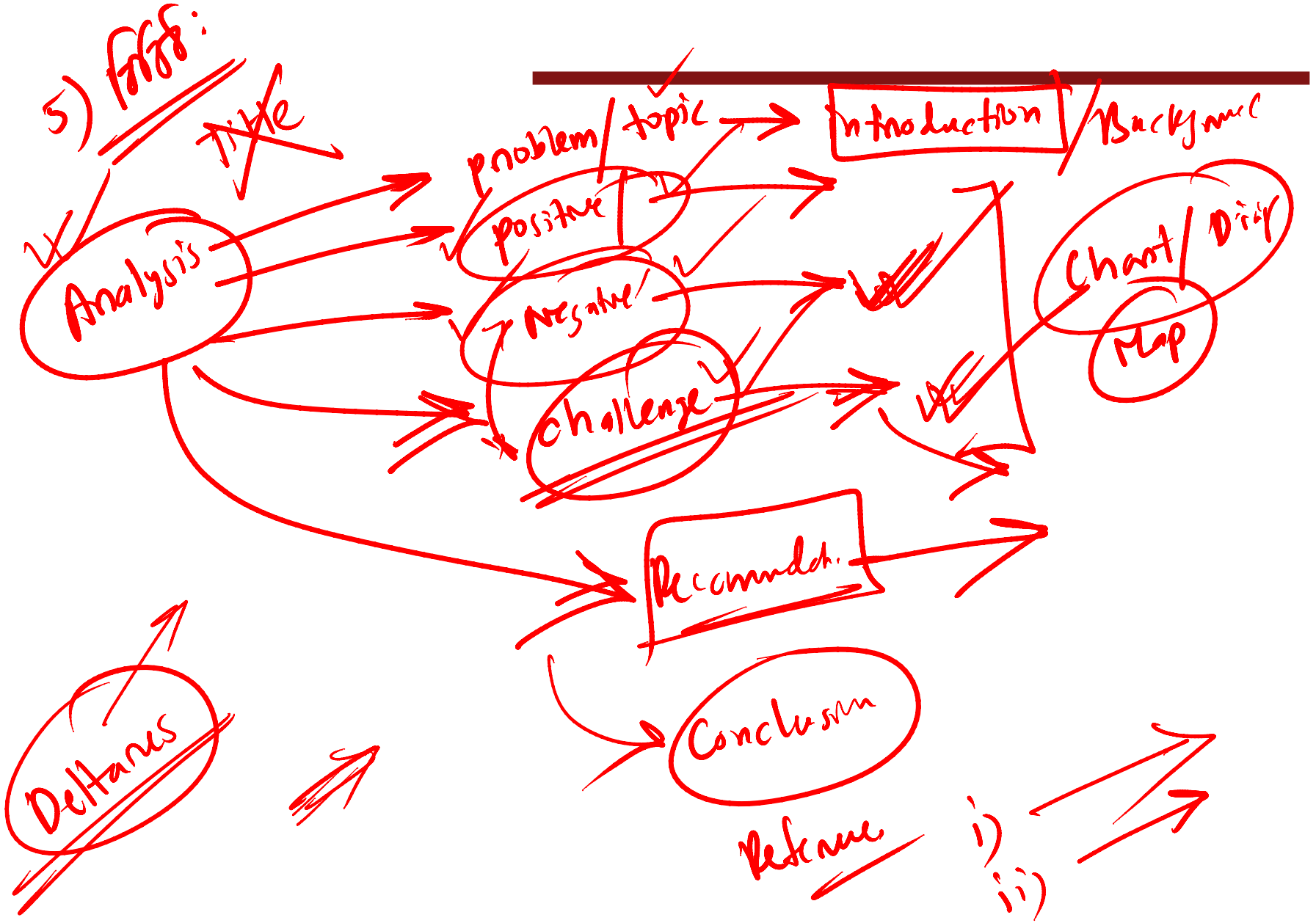

Title
problem/topic
Introduction
Analysis
positive
Negative
challenge
Chart
Map
Conclusion

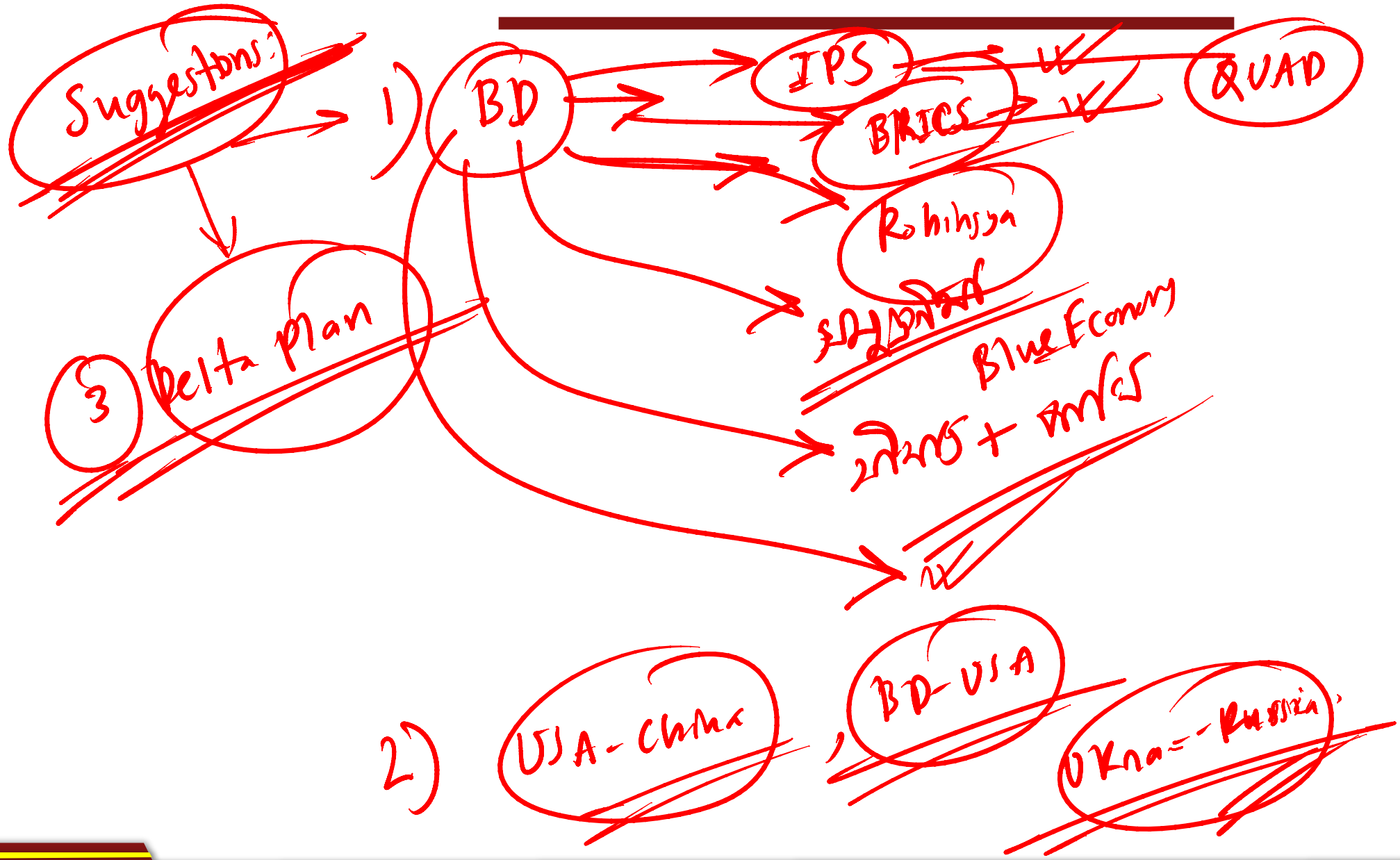

Suggestions:
1)
BD
IPS
QUAD
BRICS
Rohingya
Blue Economy
3
Delta plan
2)
USA-China
BD-USA

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি

জাতিসংঘ সনদের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত একটি জাতি হিসেবে সকল দায়-দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ তার পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করে। স্বাধীনতার পর নতুন মন্ত্রিসভায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি কিছুটা পরিবর্তন করে পররাষ্ট্রনীতির অনেকগুলো মূলনীতি সন্নিবেশিত করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় "মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন" করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে। এরই অনুসরণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ৪টি মূল স্তম্ভ নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ৪টি মূল স্তম্ভ হলো-

- ✓ জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা।
- ✓ অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।
- ✓ আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান।
- ✓ আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য

- ✓ রাষ্ট্রের প্রধান স্বার্থ (স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা এবং নিরাপত্তা) রক্ষার পাশাপাশি গৌণ স্বার্থ (অর্থনৈতিক স্বার্থ, সামরিক স্বার্থ, রাজনৈতিক স্বার্থ, কূটনৈতিক স্বার্থ) সংরক্ষণে সর্বদা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
- ✓ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে রয়েছে মিশ্র অর্থনীতির প্রভাব। বাংলাদেশ একচ্ছত্রভাবে পুঁজিবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেয় না। আবার সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে বিশ্বাসী হিসেবেও পরিচয় দেয় না।
- ✓ বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য হওয়ায় জোট নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করে।
- ✓ বাংলাদেশ তার পররাষ্ট্রনীতিতে ভাববাদ ও বাস্তববাদের ভারসাম্য বজায় রেখে চলে অর্থাৎ জাতীয় ঐতিহ্য, মতাদর্শের ও মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেওয়ার পাশাপাশি জাতীয় স্বার্থকেই বড় করে দেখে।
- ✓ ভৌগোলিকভাবে ভারসাম্য রক্ষায় বাংলাদেশ কৌশলী পররাষ্ট্রনীতির পরিচয় দিচ্ছে। বাংলাদেশ কৌশলগত কারণে কোনো পক্ষকে একক সমর্থন না দিয়ে তার পররাষ্ট্রনীতি সাজিয়েছে।
- ✓ "Friendship is to all and malice towards none" এই নীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশ তার পররাষ্ট্রনীতি সাজিয়েছে।
- ✓ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বহির্বিশ্বে নিজেকে একটি নৈতিক রাষ্ট্র হিসেবে উপস্থাপন করা। বাংলাদেশ সর্বদা অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের পক্ষে কথা বলে।
- ✓ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে উদারতাবাদের প্রতিটি উপাদানেই বিদ্যমান।
- ✓ জাতীয় শক্তিমত্তা (National Power) বৃদ্ধিতে গুরুত্বারোপ করা।
- ✓ বিবাদপূর্ণ সম্পদের ন্যায্য হিসাব বুঝে নেওয়া, দেশের প্রতি দেশের জনগণের একাগ্রতা, ভক্তি, দেশপ্রেম তৈরি করা এবং তা বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য

স্বাধীনতার ৫০ বছরে এসে বাংলাদেশ তার কূটনৈতিক দক্ষতা ও পররাষ্ট্রনীতির যথার্থ প্রয়োগ করে যে সব ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছে-

- ✓ ১৯৭২ সালের মধ্যেই ৪৮টি দেশের স্বীকৃতি আদায়। ২০২২ সাল পর্যন্ত ১২০ এর অধিক দেশ বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।
- ✓ চীন ভেটো দেওয়া সত্ত্বেও কূটনৈতিক তৎপরতার কারণে পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ অর্জন।
- ✓ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর দক্ষ কূটনীতির কারণে ভারতীয় সেনাবাহিনী ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল।
- ✓ বাংলাদেশের দক্ষ কূটনীতির কারণে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করে ছিটমহল সমস্যার সমাধান করা গেছে।
- ✓ মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা জয় লাভ করেছে। বাংলাদেশ তার কৌশলী পদক্ষেপের কারণে দুই দেশের সাথে ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি. সমুদ্রসীমা জয় করতে পেরেছে।
- ✓ বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে আজ বাংলাদেশ বিশ্ব জলবায়ু সমস্যা নিরসনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।
- ✓ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সৈন্য প্রেরণে তার শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছে। বিশ্বের ৪০টি দেশের ৫৪টি মিশনে বাংলাদেশ নিয়োজিত রয়েছে।

দ্বিপাক্ষিক বিষয়াবলি

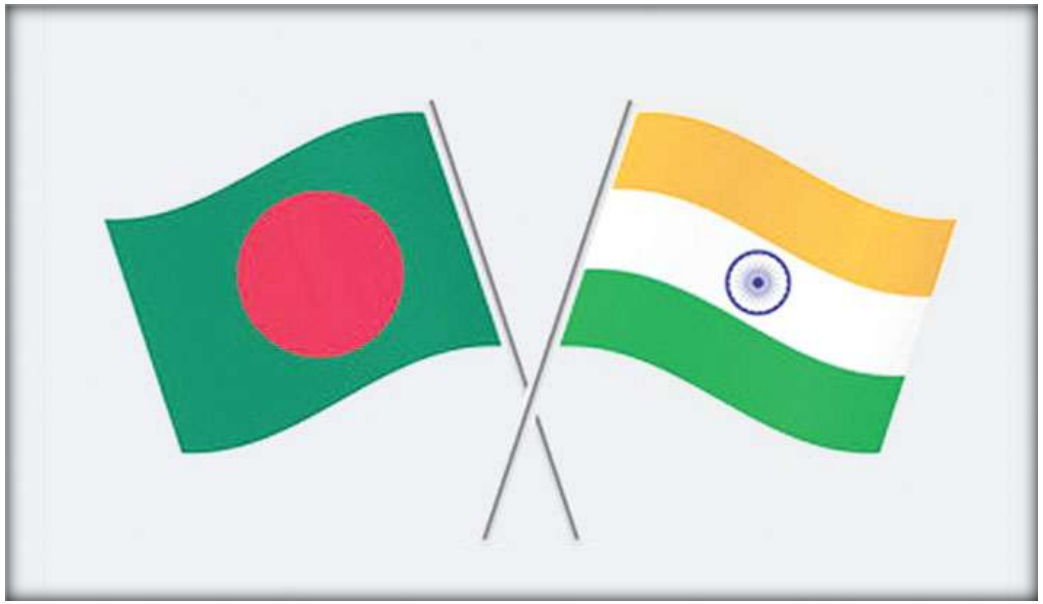

ভারত-বাংলাদেশ সমস্যা

সমস্যা

- **পানি বণ্টন সমস্যা :** বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তাসহ ৫৪টি আন্তর্জাতিক নদী প্রবাহিত হচ্ছে। এসব নদীর পানি প্রবাহ ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে বলে বাংলাদেশ পানির প্রবাহের জন্য ভারতের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প, যৌথ নদীগুলোতে বাঁধ নির্মাণ ও বিভিন্ন সময়ে দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলো বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে বাংলাদেশ ও ভারতের মাঝে নদীর পানি বণ্টন বিষয়ক সমস্যা রয়েই গেছে।

- **ফারাক্কা বাঁধ:** ১৯৬১ সালে গঙ্গায় এর নির্মাণ কাজ শুরু করে ভারত যা ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল চালু করে। ৭৩৫০ ফুট লম্বা এই বাঁধটি পশ্চিমবঙ্গের মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জুড়ে অবস্থিত। ফারাক্কা বাঁধের কারণে পদ্মা নদীর পানিপ্রবাহ কমে গেছে।

ফলে একই সাথে কমে গেছে পলি, কার্বন ও পুষ্টি উপাদান প্রবাহ। এর প্রভাবে তীরবর্তী অঞ্চলের মাটির উর্বরতা যেমন কমছে তেমনি নদীতে মাছের উৎপাদন কমেছে উল্লেখযোগ্য হারে। শুষ্ক মৌসুমে নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় বাংলাদেশ হারাচ্ছে প্রায় ৩২০ কিলোমিটার নৌপথ, ভূগর্ভস্থ পানির স্তরও নেমে যাচ্ছে আশঙ্কাজনক হারে। আবার আগস্ট, সেপ্টেম্বরে বাঁধের গেট খুলে দেওয়ায় অতিরিক্ত পানি প্রবাহে বাংলাদেশে বন্যা সংঘটিত হচ্ছে।

ভারত-বাংলাদেশ সমস্যা

- **তিস্তা বাঁধ:** বাংলাদেশ সীমান্তের ৬০ কিলোমিটার উজানে ভারত তিস্তা নদীর পানিপ্রবাহ পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে জলপাইগুড়ির গজলডোবাতে তিস্তা বাঁধ নির্মাণ করে। দুই দেশের যৌথ নদী কমিশন একাধিক বৈঠক করে তিস্তার পানি বণ্টন সমস্যার সমাধান করতে ঐক্যমত্য হলেও এখন পর্যন্ত তা অমীমাংসিত রয়ে গেছে। এই বাঁধের প্রভাবে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের প্রধান নদীসমূহ যেমন আত্রাই, পুনর্ভবা, করতোয়া, বাঙালি ইত্যাদি শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে, ছোট ছোট অনেক নদী ইতোমধ্যে মরেও গেছে। নদীর পানি শুকিয়ে যাওয়ায় উত্তরাঞ্চলের জন্য প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকায় নির্মিত দেশের সবচেয়ে বড় সেচ প্রকল্প অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

- **টিপাইমুখ বাঁধ:** বাংলাদেশের সিলেটের সীমান্ত থেকে ১০০ কিলোমিটার উজানে ভারতের মণিপুর রাজ্যের টিপাইমুখে বরাক ও তুইভাই নদীর মোহনায় জল বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বাঁধের নাম টিপাইমুখ বাঁধ। পরিবেশবিদরা আশঙ্কা করছেন, টিপাইমুখ বাঁধ নির্মিত হলে সুরমা, কুশিয়ারা ও মেঘনা অববাহিকার ২৭৫.৫ বর্গ কি.মি. এলাকায় পরিবেশ বিপর্যয়সহ এই অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকা, অর্থনীতি, প্রাণিবৈচিত্র্য সবকিছুর উপর তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি কুফল দেখা দেবে, ঐ অঞ্চলের স্বাভাবিক পরিবেশ ও ইকোসিস্টেমকে বাধাগ্রস্ত করবে।

ভারত-বাংলাদেশ সমস্যা

- **আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প :** ভারত তার উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পানি ঘাটতি সম্পন্ন রাজ্যগুলোর পানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও তাদের অববাহিকার সকল নদ নদীতে বাঁধ দিয়ে এবং খাল কেটে পানি সরবরাহের এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই মহাপরিকল্পনায় ভারতের ছোট-বড় ৩৮টি নদীকে ৩০টি সংযোগকারী খালের মাধ্যমে জুড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্ষার সময় ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় প্রাপ্ত অতিরিক্ত পানি শুকনো মৌসুমে কৃষিকাজসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য ৭৪টি জলাধার ও বেশ কিছু বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে ধরে রাখা হবে। ভারতের এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের জন্য তা ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনবে।
  বিশেষজ্ঞদের মতে, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তা সহ নদী সমূহের উজানে বাঁধ দিয়ে বা খাল কেটে পানি প্রত্যাহার করা হলে বাংলাদেশে এসব নদীর পানিপ্রবাহ যেমন হ্রাস পাবে, তেমনি পরিবেশের উপরও বিরূপ প্রভাব পড়বে। দেশের উত্তরাঞ্চলের বিশাল এলাকা মরুভূমিতে পরিণত হবে। তাছাড়া নদীগুলো তাদের নাব্যতা হারানোর ফলে এতে নৌ চলাচলসহ মাছের পরিমাণ হ্রাস পাবে এবং পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার কারণে আর্সেনিকের সমস্যা বাড়বে। এছাড়াও ধান ও গমের মতো খাদ্য শস্য উৎপাদন ৭০-৮০% কমে যেতে পারে।

- **সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ:** আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে ভারত বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হলে মহীসোপানের দাবিকে ঘিরে দুই দেশের পাল্টাপাল্টি অবস্থান এবং বেইজ লাইন নিয়ে আপত্তি নতুন এক বিরোধ সামনে এনেছে। মহীসোপানের দাবি নিয়ে দুই দেশই জাতিসংঘে চিঠি দিয়েছে। বাংলাদেশের নতুন বেইজ লাইনের ২ ও ৫ নম্বর পয়েন্টের অবস্থান নিয়ে ভারতের আপত্তি। বাংলাদেশ বলছে আন্তর্জাতিক আইন মেনেই আমরা বেইজ লাইন ঠিক করেছি বরং ভারতের ৮৭ ও ৮৯ নম্বর বেইজ লাইন বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

ভারত-বাংলাদেশ সমস্যা

- **সীমান্তে হত্যা :** বাংলাদেশ ও ভারতের মাঝে রয়েছে ৪,১৫৬ কিলোমিটার সীমান্ত, যা বিশ্বের ৫ম বৃহত্তম সীমান্ত। ভারতের সাথে আরো পাঁচটি দেশের সীমান্ত থাকলেও বাংলাদেশের সাথেই সীমান্ত সবচেয়ে দীর্ঘ। এই সুদীর্ঘ সীমান্তে বেআইনী অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, মাদক পাচার ইত্যাদি সমস্যাও প্রকট। ফলে প্রায়শই ভারতের বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নাগরিক নিহত হওয়ার খবর শোনা যায়। গত ১০ বছরে মোট ২৯৪ জন বাংলাদেশি নিহত হন বিএসএফের হাতে।

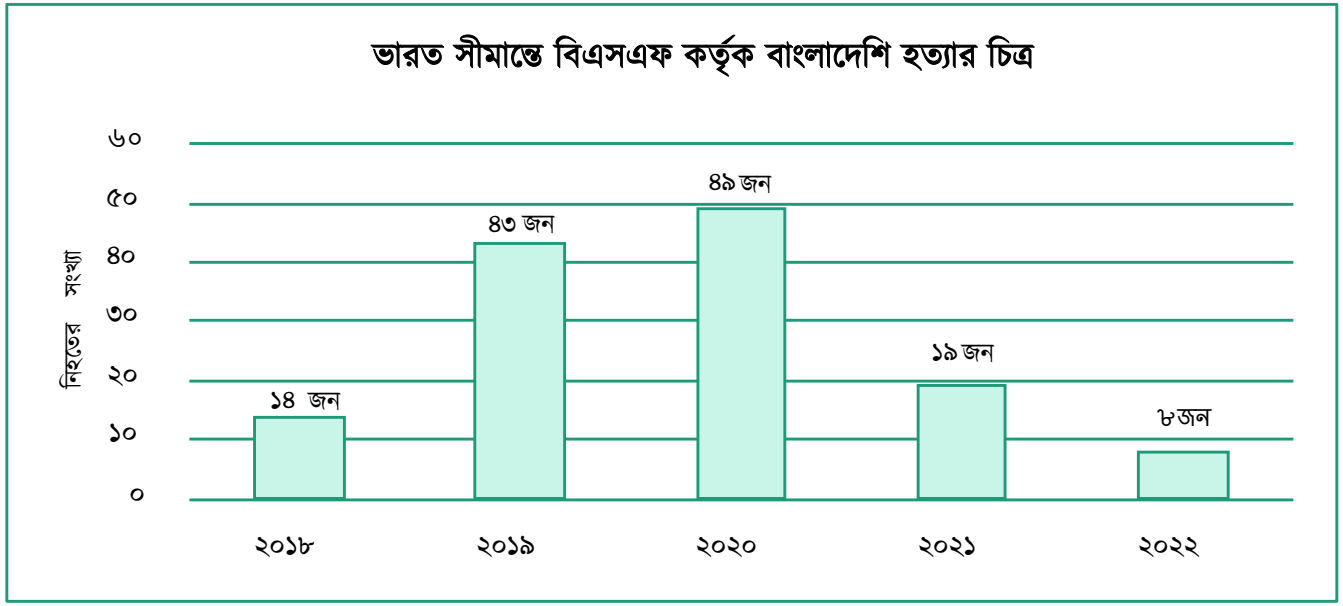

[তথ্যসূত্র: আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ২০২২]

ভারত-বাংলাদেশ সমস্যা

- **বাণিজ্যে ঘাটতি :** ভারতের সাথে বাণিজ্য ঘাটতি বাংলাদেশের জন্য ২য় বৃহত্তম বাণিজ্য ঘাটতি। ভারত বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তাছাড়াও ভারত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে Anti-Dumping Duty ও Counterveiling Duty আরোপ করে বাণিজ্য বাধা সৃষ্টি করে। মাঝে মাঝে আবার ভারত বাংলাদেশে জরুরি ভোগ্যপণ্য কোনো পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই রপ্তানি বন্ধ করে দিয়ে সংকটের সৃষ্টি করে। যেমন: ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ সালের তারিখে ভারত কোনো আগাম ঘোষণা ছাড়াই পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দেয়। ফলে দেশে পেঁয়াজের দামের অস্বাভাবিক স্ফীতি ঘটে।

সর্বশেষ ৪ বছরে ভারতের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যের চিত্র

অর্থবছর	বাংলাদেশের আমদানি	বাংলাদেশের রপ্তানি	বাণিজ্য ঘাটতি
২০২১-২২	১৬১৯ কোটি ডলার	১৯৯ কোটি ডলার	১৪২০ কোটি ডলার
২০২০-২১	৮৮৯ কোটি ডলার	১২৮ কোটি ডলার	৭৬১ কোটি ডলার
২০১৯-২০	৫৭৯.৩ কোটি ডলার	১০৯.৬ কোটি ডলার	৪৬৯.৭ কোটি ডলার
২০১৮-১৯	৬৯৩ কোটি ডলার	১০৭ কোটি ডলার	৫৮৬ কোটি ডলার

[তথ্যসূত্র: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো- ২০২২]

ভারত-বাংলাদেশ সমস্যা

- **NRC তালিকা:** ২০১৯ সালের ৩০ আগস্ট প্রকাশিত হয় আসামের National Register of Citizens (NRC) তালিকা। তালিকা থেকে ১৯ লাখ বাঙালি বাদ পড়েছে বলে জানানো হয়। তালিকার সারমর্মে বলা হয়, বাদ পড়া অধিবাসীরা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আগে গিয়েছেন এমনটা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বিজেপি প্রধান অমিত শাহ ২০১৯ সালের ১০ অক্টোবর তারিখে বলেন, "ভারতের সব অনুপ্রবেশকারীকে তাড়ানো হবে এবং ভারত একজনও অবৈধ মুসলিমকে আশ্রয় দিবে না।" ভারতের এ ধরনের বক্তব্য বাংলাদেশের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ভারত-বাংলাদেশ সমস্যা

সম্ভাব্য সমাধান ও সুপারিশ (Recommendations)

- বাংলাদেশের সাথে অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন নিয়ে ভারতের সাথে বিরোধ মেটাতে ন্যায্যতার ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়নের জন্য ভারতকে চাপ দিতে বাংলাদেশ কিছু বিষয় সামনে নিয়ে আসতে পারে:
  - ✓ বাংলাদেশ ১৯৬৬ সালের হেলসিংকি সনদ এবং ১৯৯৭ সালের জাতিসংঘের জলপ্রবাহ সনদ উল্লেখ করে ভারতকে তা মেনে চলার আহ্বান জানাতে পারে। ১৯৬৬ সালের অভিন্ন নদীর পানি ব্যবহার সংক্রান্ত হেলসিংকি নীতিমালায় বলা হয়েছে, "প্রতিটি অববাহিকাভুক্ত রাষ্ট্র অভিন্ন নদীগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই অন্য রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজন বিবেচনায় নিবে।" আবার ১৯৯৭ সালের জাতিসংঘের জলপ্রবাহ কনভেনশন অনুযায়ী প্রণীত আইনে বলা হয়েছে, "নদীকে এমনভাবে ব্যবহার করা যাবে না, যাতে অন্য দেশ মারাত্মক ক্ষতি বা বিপদের মুখে পড়বে"।
  - ✓ বাংলাদেশের ভূখণ্ডের উপর দিয়ে ভারত পণ্য পরিবহণের জন্য তুলনামূলক অত্যন্ত স্বল্প খরচে ট্রানজিট ও ট্রানশিপমেন্ট সুবিধা ভোগ করে আসছে। এটি বাংলাদেশের কাছে ভারতের অন্যতম প্রধান স্বার্থ। ভারতকে নদীর পানি বণ্টনের জন্য কার্যকর চুক্তি সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ এই ট্রানজিট ও ট্রানশিপমেন্ট সুবিধাটি ব্যবহার করে কূটনৈতিক চাপ দিতে পারে। ভারতের কাছে বাংলাদেশের কূটনীতিবিদরা এই বার্তা পাঠাতে পারে যে, বাংলাদেশ সরকার যেকোন সময় ট্রানশিপমেন্ট বন্ধ করে দিতে পারে এবং তিস্তা চুক্তি না হলে বাংলাদেশ সরকার ভারতের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুনরায় ভেবে দেখবে।

ভারত-বাংলাদেশ সমস্যা

- CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) হলো একটি আঞ্চলিক বাণিজ্যিক চুক্তি যা পণ্য ও পরিষেবা, বিনিয়োগ, অবকাঠামো প্রকল্প এবং ই-কর্মাস ব্যবসার ব্যবস্থাপনা ও নীতি-নৈতিকতার অংশ নিয়ে আলোচনা করে। এটি বাংলাদেশ ও ভারতের নিজস্ব ব্যবসার নিয়ম-নীতি বা পলিসিগুলোর সমন্বয়ের মাধ্যমে দুই দেশকে পরস্পরের সঙ্গে অর্থনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা দেয়। দুই দেশের জন্যই বিনিয়োগের নতুন জানালা খুলে দিবে সিইপিএ।

- যেহেতু বাংলাদেশ BIMSTEC, ASEAN, BCIM ইত্যাদি বাণিজ্যিক জোটগুলোর Transit কেন্দ্র, সেহেতু ভারত বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হতে বাংলাদেশের সহযোগিতা প্রত্যাশা করে। এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ ভারতের কাছে তার নিজের দাবিগুলো পেশ করতে পারে।

- NRC ইস্যুতে বাংলাদেশ সরকার ভারতকে স্পষ্ট করে দিতে পারে যে, ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের পর ভারতে গেলেও এর আগে যদি তার পিতা-মাতা বা পরিবারের কেউ ভারতে যেয়ে থাকে তাহলে তারা অবৈধ বাংলাদেশি হতে পারে না। তাছাড়া ভারতকে ১৯৫৪ সালের ইতিহাস মনে করিয়ে দিতে পারে যখন মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরার জন্য বিভিন্ন সময়ে এনআরসি বিভিন্নভাবে সংশোধিত হয়েছিল।

ভারত-বাংলাদেশ সমস্যা

- বাংলাদেশে প্রচুর ভারতীয় নাগরিক বৈধ-অবৈধভাবে অবস্থান করে কাজ করে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (TIB) এর এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে বাংলাদেশ ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ২য় বৃহত্তম উৎস। বাংলাদেশ সরকার অবৈধভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগের কথা বলে ভারত সরকারকে এই বার্তা প্রেরণ করতে পারে যে, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে বৈষম্য দূর করে সমতা না আনলে বাংলাদেশও কঠোর অবস্থানে যেতে পারে।

- বাণিজ্যে বৈষম্য দূর করার জন্য বাংলাদেশ ভারতকে মনে করিয়ে দিতে পারে যে বাংলাদেশ ভারতের সবচেয়ে বড় রপ্তানি হিস্যার উৎস। বাংলাদেশের সাথে রয়েছে ভারতের সবচেয়ে বড় সীমান্ত। এই সীমান্ত অঞ্চলে চোরাচালান, অবৈধ অনুপ্রবেশ ও জঙ্গি সন্ত্রাসবাদীদের কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে বাংলাদেশ ভারতকে একযোগে কাজ করার প্রস্তাব দিয়ে বিনিময়ে বাংলাদেশের সাথে ভারতের বাণিজ্য ক্ষেত্রে ঘাটতি দূর করা ও অন্যান্য উদ্যোগ নিতে আহ্বান জানাতে পারে। এছাড়াও ভারত থেকে আমদানিকৃত কাঁচামাল ও কৃষিপণ্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারকে আরো স্বনির্ভর করে তোলার উদ্যোগ নিতে পারে।

ভারত-বাংলাদেশ সমস্যা

International References

- ১৯৬৬ সালের হেলসিংকি সনদ ও ১৯৯৭ সালের জাতিসংঘের জলপ্রবাহ সনদ মেনে চলতে পারে।
- আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন বিষয়ক আদালত ITLOS ও PCA এর রায় কার্যকর করা যেতে পারে।
- আন্তর্জাতিক স্থলসীমা আইন মেনে BSF তাদের কার্যক্রম চালাতে পারে। আন্তর্জাতিক স্থলসীমা আইন অমান্য করলে তার জন্য International Law and Territorial Boundary এর আওতায় মামলা করা যেতে পারে।

চীন-বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের রূপরেখা

সমস্যা ও স্বার্থ: বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ভারত ও চীনের অবস্থান

- **সাংস্কৃতিক :** ভারত এবং চীন, দুটি দেশের সঙ্গেই বাংলাদেশের রয়েছে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিক এবং সামরিক সহযোগিতার সম্পর্ক। তবে এর মধ্যে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণে ভারতের সঙ্গেই বাংলাদেশের সম্পর্কটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। চীনের তুলনায় ভারত যেদিকে এগিয়ে আছে, তা হলো বাংলাদেশের ওপর তাদের সাংস্কৃতিক প্রভাব। প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক ফরেস্ট কুকসন এবং টম ফেলিক্স ক্রোয়েন এর মতে, এই প্রভাব খুবই ব্যাপক। দুই দেশের রয়েছে অভিন্ন ভাষা (বাংলা) ও সংস্কৃতি। বাংলাদেশের অন্তত এক লাখ ছাত্র-ছাত্রী ভারতের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। এর বিপরীতে চীনের সাংস্কৃতিক প্রভাব নগণ্য। ঢাকায় চীন একটি কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছে। সেখানে চীনা ভাষা শেখানো হয়।

চীন-ভারত-বাংলাদেশ

- **বাণিজ্যিক :** বাংলাদেশের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় চীন-ভারত দুটি দেশই মূলত বাণিজ্যকেই ব্যবহার করতে চাইছে। বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে চীন ও ভারত থেকেই। বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দুটি দেশই সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। দুটি দেশেরই বিপুল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত আছে বাংলাদেশের সঙ্গে। চীন ও ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য কেমন, তা জানা যায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যেও।

ভারত ও চীন থেকে বাংলাদেশের আমদানির চিত্র

ভারত		চীন	
২০১৯-২০	৬,৬৬৩ মিলিয়ন ডলার	২০১৯-২০	১৪,৩৬০ মিলিয়ন ডলার
২০২০-২১	১০,৩৩৪ মিলিয়ন ডলার	২০২০-২১	১৬,৯৭৪ মিলিয়ন ডলার
২০২১-২২	১০,০২৬ মিলিয়ন ডলার	২০২১-২২	১৬,১৩৯ মিলিয়ন ডলার

[তথ্যসূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২২]

চীন-ভারত-বাংলাদেশ

- **বিনিয়োগ:** বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত চীনের বিনিয়োগ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ৫ বছরে গড়ে চীন প্রায় ৮-৯ বিলিয়ন ডলার হারে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করছে। অন্যদিকে, ভারতও বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে কিন্তু তা চীনের ৫ ভাগের ১ ভাগ। বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশে ভারত ও চীনের বিনিয়োগ চিত্র তুলে ধরা হলো –

চীনের বিনিয়োগ		ভারতের বিনিয়োগ	
অর্থবছর	বিনিয়োগের পরিমাণ	অর্থবছর	বিনিয়োগের পরিমাণ
২০২০-২১	১০ বিলিয়ন ডলার	২০২০-২১	১.৩৭ বিলিয়ন ডলার
২০২১-২২	৯.৪০ বিলিয়ন ডলার	২০২১-২২	৩.০০ বিলিয়ন ডলার

চীন-ভারত-বাংলাদেশ

➢ **অবকাঠামো খাতে প্রতিযোগিতা :** দুটি দেশই বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতে ব্যাপক সাহায্যের প্রস্তাব দিচ্ছে। বাংলাদেশে বড় আকারে রেল প্রকল্পে আগ্রহী দুটি দেশই। গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনেও ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে উভয় দেশের। ভারত ও চীনের অবকাঠামো সহায়তাগুলো তুলে ধরা হলো –

ভারত	চীন
■ রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র, বাগেরহাট ■ ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন (শিলিগুড়ি, কলকাতা – পার্বতীপুর, দিনাজপুর) ■ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ	■ বঙ্গবন্ধু টানেল ■ পদ্মাসেতু রেল সংযোগ প্রকল্প ■ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ■ ইস্টার্ন রিফাইনারির ২য় ইউনিট স্থাপন ■ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ

চীন-ভারত-বাংলাদেশ

- **সামরিক খাতে প্রতিযোগিতা :** বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে চীনা ট্যাংক, নৌবাহিনীকে রণতরী, মিসাইল বোট এবং বিমান বাহিনীকে ফাইটার জেট দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে। ২০০২ সালে চীন এবং বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করে যার আওতায় মিলিটারি প্রশিক্ষণ রয়েছে। ২০০৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয় যে, বাংলাদেশ চীনা অস্ত্রের অন্যতম বড় ক্রেতা হয়ে উঠছে। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী চীন থেকে দুইটি সাবমেরিন 'নবযাত্রা' ও 'জয়যাত্রা" তার অস্ত্রভাণ্ডারে যুক্ত করে। এ ছাড়াও, ২০১৭ সালে বাংলাদেশ চীনের কাছ থেকে এফএম-৯০ ক্ষেপণাস্ত্র কিনেছে। অন্যদিকে ভারত এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। কেননা ভারতের সামরিক সরঞ্জামের মান নিয়ে প্রশ্ন আছে বাংলাদেশের।

- **অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অবস্থান :** বাংলাদেশের রাজনীতিতে চীনের প্রভাব তেমন লক্ষ করা না গেলেও ভারতের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের রাজনীতির পট পরিবর্তন হলে ভারতের দুশ্চিন্তা হয় তার কারণ হলো বাংলাদেশের কিছু রাজনৈতিক দল এখনো পাকিস্তানকে সমর্থন দেয় এবং সাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনা ধারণ করে। এসব রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসলে ভারত দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে সমস্যায় পড়ে যায়। এজন্য বাংলাদেশের রাজনীতির উপর ভারতের সবসময় নজর থাকে।

চীন-ভারত-বাংলাদেশ

- **সাম্প্রতিক সমস্যা:** সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ভারত ও চীনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে গিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। আর এই প্রশ্নগুলোই হলো- বাংলাদেশ-ভারত-চীন সম্পর্কের গতিধারার ক্ষেত্রে বাঁধা। **যেমন:**
  - ✓ ভারত ও জাপান বাংলাদেশকে QUAD এ যোগদান করতে বললে বাংলাদেশ একরকম রাজি হয়ে যায়। কিন্তু চীনের চাপে বাংলাদেশ আর QUAD-এ যোগদান করেনি।
  - ✓ চীন বাংলাদেশের সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করতে চাইলে ভারত আপত্তি তুলে। ভারতের আপত্তির কারণে বাংলাদেশ এ প্রকল্প বাতিল করে।
  - ✓ যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ভারতের উদ্যোগে বাংলাদেশকে IPEF এ আমন্ত্রণ জানালে চীন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে 'আমরা (চীন ও বাংলাদেশ) এসব জোট ছাড়াই ভালো আছি। এখন বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ কী করবে?'
  - ✓ শি জিন পিং এর উদ্যোগে গঠিত 'Belt and Road Initiative' এর বিকল্প হিসেবে নরেন্দ্র মোদির 'Cotton Road Initiative' এ বাংলাদেশকে যোগ দিতে তাগিদ দেয় ভারত।

দীর্ঘ সময় ধরে এই অঞ্চলে চীন ও ভারতের মধ্যে নানা কারণে সম্পর্কের সংকট তৈরি হয়েছে। কিন্তু সেই সংকটে বাংলাদেশের অবস্থান যেন কারো জন্য অস্বস্তিকর না হয়, সে ব্যাপারে বাংলাদেশ সবসময় তৎপর। চীন বা ভারত কারো জন্যই তাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের অবনতি উসকে দেওয়া বা সহায়তা করার মতো কোনো অবস্থানকে বাংলাদেশ কোনোভাবেই সঠিক মনে করে না বরং আশা করে, এ অঞ্চলের এই দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যেও পারস্পরিক আস্থার সম্পর্ক গড়ে উঠুক।

চীন-ভারত-বাংলাদেশ

সম্ভাব্য সমাধান ও সুপারিশ (Recommendations)

- বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দুই দেশের সাথে আলাদা আলাদা সুযোগগুলো চিহ্নিত করতে হবে। যেমন: বাংলাদেশ ভারত থেকে ভোগ্যপণ্য বেশি আমদানি করে। অন্যদিকে চীন থেকে ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ও খুচরা যন্ত্রাংশ বেশি আমদানি করে।
- বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে চীনের সহায়তা ভারতের চেয়ে অনেক বেশি। এ নিয়ে ভারত যেন বাংলাদেশকে ভিন্নভাবে না দেখে সে ভুল ভাঙানো যেতে পারে।
- SAARC ও ASEAN এর ট্রানজিট কেন্দ্রে অবস্থিত বাংলাদেশ। তাই চীন কিংবা ভারত যেন বাংলাদেশকে সাকো হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- চীন ও ভারত কেন্দ্রীক প্রকল্প সহায়তা থেকে বের হয়ে অন্যদের সুযোগ দিলে ভারত ও চীনের ভুল ভাঙবে। যেমন: BIG-B, মেট্রোরেল ও মহেশখালি বিদ্যুৎকেন্দ্রে জাপান সহায়তা দিচ্ছে। ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে নেদারল্যান্ডস সহায়তা দিচ্ছে।
- ভারত ও চীনকে পাশ কাটিয়ে SEACO, D-8 এর মতো নতুন জোট গঠন করা যেতে পারে।
- 'বাংলাদেশের উন্নয়নে যারা অংশীদার সকলেই বাংলাদেশের বন্ধু' – মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই মতবাদ ভারত ও চীনের সামনে উপস্থাপন করা যেতে পারে।
- বাংলাদেশ, ভারত ও চীন সবাই APTA ও BCIM এর সদস্য। এই দুটি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ধারণার কার্যকারিতার জন্য বাংলাদেশের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে, যাতে বাংলাদেশ বাণিজ্য ঘাটতির বিষয়টি মীমাংসা করতে পারে।
- বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারত ও চীনকে সাময়িকভাবে এড়িয়ে চলা। এই দুটি দেশের কঠোর ঋণ নীতি বাংলাদেশের জন্য বোঝা হয়ে যাচ্ছে।

চীন-ভারত-বাংলাদেশ

- Cotton Road পরিকল্পনা ও মার্কিন FOIP Strategy এর অংশীদার হিসেবে ভারতের কাছে এবং New Silk Road কর্মসূচির জন্য চীনের নিকট বাংলাদেশ খুবই স্পর্শকাতর ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট। তাই ভারত ও চীনকে তাদের স্বার্থের জন্য বাংলাদেশের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিয়ে এই প্রভাব মোকাবিলা করা যেতে পারে।
- বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত চীন ও ভারতের মধ্যে একটা ভারসাম্য নীতি বজায় রেখেছে। কিন্তু এর ভারসাম্য রাখাটা কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ ভারসাম্য রাখতে ব্যর্থতা যেকোনো একটি দেশের সঙ্গে শত্রুতা তৈরি করতে পারে। তাই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির সফলতা নির্ভর করবে কতটা দক্ষতার সঙ্গে বাংলাদেশ এ ভারসাম্যের দঁড়িতে হাঁটতে পারে।

চীনের কাছাকাছি অবস্থান হওয়ার কারণে স্বাধীন ও যুগোপযোগী পররাষ্ট্রনীতি বাংলাদেশকে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারে। বঙ্গোপসাগরকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে বাংলাদেশ ইন্দো-প্যাসিফিক অর্থনৈতিক করিডরের কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে এবং দক্ষিণ এশিয়া থেকে শুরু করে মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনের মধ্যে যোগাযোগে অবদান রাখতে পারে। কিন্তু তার জন্য বাংলাদেশকেই আগ্রহী হতে হবে। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিবেচনা বা ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রশ্ন নয়, দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রে জো বাইডেন প্রশাসনে বাংলাদেশ বিষয়ে ভারতকেন্দ্রিক নীতির পরিবর্তন হবে কী না, সেটা এখনো স্পষ্ট নয়। কিন্তু এ অঞ্চলে চীনের প্রভাব কমাতে শুধু ভারতের ওপর নির্ভরতা বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্যতার জন্য ইতিবাচক নয়। তাই বাংলাদেশকে সতর্কতার সাথে আগাতে হবে এবং নিজের কৌশলগত অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে সর্বোচ্চ সুবিধা আদায় করতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের গতিধারা

১৯৭১ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অর্থাৎ দীর্ঘ ৫০ বছরে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক তুলে ধরা হলো-

- ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বিপক্ষে কাজ করলেও যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকরা বাংলাদেশের পক্ষে ছিল। ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় এবং সম্পর্কের নতুন ধারার সূচনা করে।
- ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের উপর চালানো গণহত্যার স্বীকৃতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের 'লেমকিন ইনস্টিটিউট ফর জেনোসাইড প্রিভেনশন' প্রতিষ্ঠান।
- ২৫ নভেম্বর, ২০১৩ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে বাধাগুলো চিহ্নিত করতে এবং সমাধানের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। যা Trade and Investment Co-operation Forum Agreement (TICFA) নামে পরিচিত।
- যুক্তরাষ্ট্র রোহিঙ্গা সংকটে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর দেশটির সেনাবাহিনীর চালানো সহিংসতা মানবতাবিরোধী অপরাধ 'গণহত্যা' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। রোহিঙ্গাদের জন্য নানাভাবে মানবিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। রোহিঙ্গাদের সহযোগিতার যে তহবিল রয়েছে, সেখানে সবচেয়ে বেশি ডোনেট করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়াও মিয়ানমারের সেনা শাসনের উপর বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক

- FDI (২০%) – UNCTAD এর হিসাব অনুযায়ী ২০২১ পর্যন্ত দেশে মোট এফডিআই এর পরিমাণ ২,৮৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি এফডিআই এসেছে যুক্তরাষ্ট্র হতে যা মোট এফডিআই এর ২০ শতাংশ (৫৮০ মিলিয়ন ডলার)।
- গ্যাস (৬৪%)- দেশে বর্তমানে দৈনিক গড়ে ২ হাজার ২৭০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে। এর মধ্যে ৬৩.৬৪% করছে জ্বালানি খাতের মার্কিন প্রতিষ্ঠান শেভরন। বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি রয়েছে ২০৩৩-৩৪ পর্যন্ত।
- রপ্তানি (১৯.৭%)- ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিশ্ববাজারে ৩৩৮৪৩.৪৫ মিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছে ৬৬৬৫.১৮ মিলিয়ন ডলারের পণ্য।
- বীমা (৩৮%)- দেশে বীমা খাতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২৯ হাজার ৯৩৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ মার্কিন প্রতিষ্ঠান মেটলাইফের। খাতটিতে মোট বিনিয়োগের প্রায় ৩৮ শতাংশ মেটলাইফের।
- রেমিট্যান্স (১৬.৪২%)- রেমিট্যান্স উৎস হিসেবে সৌদি আরবের পরই যুক্তরাষ্ট্র। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স আসে ২২০৭.৪ মিলিয়ন ডলার। যা বাংলাদেশের মোট প্রবাসী আয়ের ১৬.৪২ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ

সাম্প্রতিক সমস্যা

সম্প্রতি কিছু ঘটনার কারণে দুই দেশের সম্পর্কে কিছুটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাগুলো হলো-

- IPS, IPEF এ বাংলাদেশকে যোগদানের প্রস্তাব দেয় যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু চীনের কূটনৈতিক চাপের কারণে বাংলাদেশ অনাগ্রহ প্রকাশ করে।
- অতি সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ দপ্তরের 'অফিস অব ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল (ওএফএসি) বাংলাদেশের এলিট ফোর্স র‍্যাপিড একশন ব্যাটিলিয়ন (র‍্যাব)-এর সাবেক ও বর্তমান সাত শীর্ষ কর্মকর্তার ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং নিপীড়নের অভিযোগ এনে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।
- বাইডেন প্রশাসনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক প্রথম হোঁচট খায় গণতন্ত্র সম্মেলনে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ না জানানোর কারণে। তবে র‍্যাবের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে লেহি আইনে সই করার জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়। লেহি আইনে সই না করলে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তা বন্ধ থাকবে বলে জানানো হয়। লেহি আইনে সই করলে নিরাপত্তা সংস্থাগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘন করলে সহায়তা বন্ধ হবে বলে শর্ত দেওয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ

- যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বর্তমান সম্পর্ককে মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি বলেছেন 'এটা হলো বড় ভোজের আগে এপিটাইজার মাত্র' এবং ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার পক্ষে বাংলাদেশ সমর্থন জানাবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন।
- জুন, ২০১৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে জিএসপি সুবিধা স্থগিত করে। বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া শর্তের অনেকগুলো পূরণ করলেও যুক্তরাষ্ট্র জিএসপি সুবিধা পুনর্বহাল করেনি।
- বাংলাদেশের গণতন্ত্র, মানবাধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে বারবার প্রশ্ন উত্থাপন করছে যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ

সমস্যার প্রভাব

- দুই দেশের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক সংযোগ এখন ১২ বিলিয়ন (১ হাজার ২০০ কোটি) ডলার ছাড়িয়েছে, যা অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি। বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক উন্নয়ন না ঘটলে তা কমার সম্ভাবনা রয়েছে।
- রপ্তানি, এফডিআই ও রেমিট্যান্স বিবেচনায় দেশের অর্থনীতিতে সফট পাওয়ার (বাণিজ্যক, বুদ্ধিবৃত্তিক বা সাংস্কৃতিক ভাবে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা) সবচেয়ে বেশি এখন যুক্তরাষ্ট্রেরই। ২০১৬ সালেও বাংলাদেশ থেকে ৫৯১ কোটি ১ লাখ ডলারের পণ্য আমদানি করেছিলো যুক্তরাষ্ট্র। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২১-২২ অনুযায়ী বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ৬৬৬৫.১৮ মিলিয়ন ডলারে। এ হিসেবে পাঁচ বছরে দেশটির বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানি বেড়েছে ৪০% এর বেশি। সম্পর্কের এই অবনতি চলতে থাকলে বাংলাদেশ তার বৃহৎ রপ্তানি বাজার হারাবে।
- গত ৫০ বছর যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএআইডি (USAID) বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তার উন্নয়ন, মাতৃত্ব ও শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে আনা, পল্লী বিদ্যুতায়ন, দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস, ক্ষুদ্র ঋণ, মানবিক সহায়তাসহ বিভিন্ন খাতে সাত বিলিয়ন ডলার প্রদান করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিরাগভাজন হলে USAID এর কার্যক্রম বাংলাদেশে স্থগিত করে দিতে পারে।
- তৈরি পোশাকের সর্ববৃহৎ বাজার হলো যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশ যদি তাদের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক মজবুত করতে না পারে তাহলে পোশাক খাত রপ্তানি বাজার হারাবে।

যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ

সম্ভাব্য সমাধান ও সুপারিশ

- RAB যে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেনি তার তথ্যপ্রমাণ দাখিল করে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে পারে।
- বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার লঙ্ঘনের দৃষ্টান্ত টেনে তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা না দিলে বাংলাদেশকে কেন নিষেধাজ্ঞা দিবে- এই প্রশ্ন উত্থাপন করা। যেমন: ইসরায়েল প্রতিনিয়ত ফিলিস্তিনে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সেটাকে মানবাধিকার লঙ্ঘন বলছে না।
- স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে প্রতিটি দেশ তার ইচ্ছা অনুযায়ী সংগঠনে যোগদানের অধিকার রাখে।
- Good Office বা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বাংলাদেশ যুক্তরাজ্য ও কানাডাকে গ্রহণ করতে পারে। কারণ এই দুটি দেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ভালো।
- যুক্তরাষ্ট্রকে মনে করিয়ে দেয়া যেতে পারে যে, যুক্তরাষ্ট্র যদি মানবাধিকার অনুশীলন করতো তাহলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খুনিদের রাজনৈতিক আশ্রয় দিত না।
- আফগানিস্তান, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে বহুলোককে নির্বিচারে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী হত্যা করেছে। এটা কি মানবাধিকার লঙ্ঘন নয়? এই প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ আরো মনে করিয়ে দিতে পারে যে, ওয়াশিংটন জার্নালের প্রতিবেদনে ২০০৭ থেকে ২০২১ পর্যন্ত পুলিশের গুলিতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৩৭০ জন খুন হয়েছে। এটি যদি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে মানবাধিকার লঙ্ঘন না হয় তাহলে র‍্যাবের কার্যক্রম কেন মানবাধিকার লঙ্ঘন হবে?
- জিএসপি সুবিধা ফিরে পেতে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের অনেকগুলো শর্ত পূরণ করেছে। এ তথ্য তুলে ধরে প্রতিবেদন দাখিল করা যেতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক ঐতিহাসিক। বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ২০ শতাংশ অর্জন করে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক অবনতি হওয়া বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য দুই পক্ষের সহযোগিতা আবশ্যক।

চুক্তি, চুক্তির প্রকারভেদ, চুক্তির সাথে প্রটোকলের সম্পর্ক

চুক্তি

দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে প্রধানত লিখিত আকারে সম্পাদিত এবং আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যেকোনো শিরোনামযুক্ত আন্তর্জাতিক ঐকমত্য, যা একটি কিংবা দুই বা ততোধিক পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দলিলে আবদ্ধ, তাকে চুক্তি বলে।

চুক্তির প্রয়োজনীয়তা

- ✓ চুক্তির মাধ্যমে দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও সহযোগিতার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি হয়। চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অধিকার ও দায়-দায়িত্বের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে।
- ✓ চুক্তি zero-sum-game-এর পরিবর্তে win-win game-এর পরিবেশ তৈরি করে।
- ✓ চুক্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর মধ্যে মেধা, প্রতিভা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, কারিগরি নৈপুণ্য ইত্যাদি বিনিময় হয়, যা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- ✓ দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে সমন্বিত ও টেকসই সম্পর্ক সৃষ্টির দ্বার উন্মোচন হয়।

চুক্তি, চুক্তির প্রকারভেদ, চুক্তির সাথে প্রটোকলের সম্পর্ক

- ✓ চুক্তি, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বৈশ্বিক রাজনীতিসহ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলভিত্তি। চুক্তির মাধ্যমেই বিশ্ব পরিমণ্ডলে পারস্পরিক আদান-প্রদান, নির্ভরশীলতা, সহযোগিতা, যোগাযোগ, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। চুক্তি পক্ষদ্বয়ের মধ্যে শুধু partnership সৃষ্টি করে না, benefit and risk ভাগাভাগির দ্বার উন্মোচন করে।
- ✓ চুক্তি সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে Potentiality of conflict-এর পরিবর্তে Potentiality of cooperation-এর ক্ষেত্র তৈরি করে।

চুক্তির প্রকারভেদ

- ❖ **Treaty:** Treaty সাধারণত পরিপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হয়। এর বিষয়বস্তু বা পরিধি ব্যাপক এবং সাধারণত সরকারপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।
- ❖ **Convention:** Convention সাধারণত বহুপাক্ষিক চুক্তি। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হয়। এর বিষয়বস্তু বা পরিধি ব্যাপক। সাধারণত Convention সরকারপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হয়ে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তি, চুক্তির প্রকারভেদ, চুক্তির সাথে প্রটোকলের সম্পর্ক

❖ **Agreement:** Treaty বা convention-এর চেয়ে কম আনুষ্ঠানিকতায় সম্পাদিত হয় এবং সাধারণত রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধান পর্যায়ে স্বাক্ষরিত হয় না। Treaty ও Convention-এর তুলনায় কমসংখ্যক পক্ষ এবং সীমিত পরিধির চুক্তির ক্ষেত্রে এই নামটি ব্যবহৃত হয়। সরকারের বিভিন্ন Ministry বা Division-এর প্রধান এবং কারিগরি ও প্রশাসনিক চরিত্রের Agreement -এর ক্ষেত্রে Head of the department কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।

❖ **Protocol:** Protocol ৪টি অর্থে ব্যবহৃত হয়:

✓ রাষ্ট্রাচার অর্থে (State behavior);

✓ পরিবেশ সংক্রান্ত চুক্তি অর্থে

✓ যেকোনো আন্তর্জাতিক চুক্তির (Treaty, Agreement) খসড়া অর্থে;

✓ মূল চুক্তির কোনো Technical দিক বাস্তবায়ন করার জন্য ঐ চুক্তির অধীনে সম্পাদিত সম্পূরক বা পরিপূরক চুক্তি অর্থে।

মূলত, Protocol-Treaty, Agreement বা Convention-এর অতিরিক্ত অংশ। Head of the ministry or division-প্রধান এবং Attached department-এর ক্ষেত্রে Department-প্রধান কর্তৃক কম আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে এ ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হয়।

চুক্তি, চুক্তির প্রকারভেদ, চুক্তির সাথে প্রটোকলের সম্পর্ক

❖ **MOU:** MOU-হলো Less informal ঐকমত্য। অনেকটা Non-binding প্রকৃতির। Head of the ministry or Head of the division কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। MOU যদি কারিগরি বা প্রশাসনিক প্রকৃতির হয়, সে ক্ষেত্রে Head of the department কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তি যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, এদের মূল লক্ষ্য জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ। একে আবার Gentalmen's Agreement বলা হয়।

➢ Alfred T. Mahan- এর ভাষায়– "Self interest is not only legitimate but a fundamental cause for foreign policy. It is vain to expect govt. to act continuously on any other ground than national interest."

❖ **বহিঃসমর্পণ চুক্তি (Extradition) :** আন্তর্জাতিক আইনে এমন কোনো বিধান নেই যা দ্বারা অন্য রাষ্ট্রকে বহিঃসমর্পণে বাধ্য করা যাবে। তবে বহিঃসমর্পণ চুক্তির মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র অন্য একটি রাষ্ট্রকে বহিঃসমর্পণ করতে পারবে। যেমন: বাংলাদেশ ভারত ও থাইল্যান্ডের সাথে বহিঃসমর্পণ চুক্তি করেছে।

চুক্তি, চুক্তির প্রকারভেদ, চুক্তির সাথে প্রটোকলের সম্পর্ক

বহিঃসমর্পণ বা অপরাধী প্রত্যর্পণের শর্তসমূহ

- ✓ অনুরোধকারী রাষ্ট্রকে কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত নোটিশ দিতে হবে।
- ✓ প্রত্যর্পণের পূর্বে করা অন্য ফৌজদারি অপরাধের জন্য তার বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না।
- ✓ প্রত্যর্পণ ব্যক্তির জাতীয়তা বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।
- ✓ অনুরোধকারী রাষ্ট্রে অপরাধীকে যে শাস্তি দিয়েছে তা গ্রাহক রাষ্ট্রে আইনেও সমান মর্যাদা পাবে।
- ✓ প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইন কখনোই বহিঃসমর্পণের বাধ্য বাধকতা সৃষ্টি করে না।
- ✓ বহিঃসমর্পণ চুক্তিটি সবসময় দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত হয়।

উপর্যুক্ত চুক্তিসমূহ ছাড়াও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরও কিছু Soft ধরনের চুক্তি; যেমন: Modus Vivendi, Process Verbal-সহ অনেক ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত চুক্তিসমূহ Less formal এবং non-binding ধরনের।

চুক্তি, চুক্তির প্রকারভেদ, চুক্তির সাথে প্রটোকলের সম্পর্ক

মৈত্রী চুক্তি ও নিরাপত্তা চুক্তির মধ্যে পার্থক্য

মৈত্রী চুক্তি	নিরাপত্তা চুক্তি
দুটি রাষ্ট্র যখন তাদের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি স্বার্থ উদ্ধারে কোনো সহযোগিতা মূলক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তখন তাকে মৈত্রী চুক্তি বলা হয়।	একাধিক রাষ্ট্র যখন শুধু তাদের নিরাপত্তা সমুন্নত রাখার জন্য কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তখন তাকে নিরাপত্তা চুক্তি বলা হয়।
এখানে মানবিক সহায়তা হিসাবে কাজ করে।	এখানে সামরিক নিরাপত্তা হিসাবে কাজ করে।
এ চুক্তিতে বাধ্যবাধকতা থাকে না।	এ চুক্তিতে সদস্য দেশগুলো যদি অন্য রাষ্ট্র কর্তৃক নিরাপত্তা হীনতায় ভোগে তবে সকল সদস্যরা একসাথে তা প্রতিহত করবে।
যেমন: ফ্রান্স ও USA এর মাঝে Treaty of Amity & Commerce. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী চুক্তি।	যেমন: Anzus, Aukus, NATO.

IMF এর ঋণ

ভূমিকা

স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ তার আর্থিক সহায়তার জন্য অনেক সংস্থা ও দেশের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে। তবে সবচেয়ে বেশিবার ঋণ নিয়েছে IMF এর কাছ থেকে। এখন পর্যন্ত (সর্বশেষ ২০২৩ সাল সহ) বাংলাদেশ ১১ বার IMF থেকে ঋণ নিয়েছে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ প্রথম বারের মতো IMF এর কাছ থেকে ঋণ নেয়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের শাসনামল (১৯৮০-৯০) এর সময়ে সবচেয়ে বেশি বার IMF এর কাছে ঋণ চেয়েছে। এই দশ বছরে বাংলাদেশ IMF থেকে ৫ বার ঋণ নিয়েছে। সর্বশেষ ২০২২ সালে বাংলাদেশ ৪৫০ কোটি ডলার ঋণ সহায়তার জন্য IMF এর কাছে আবেদন করে।

IMF এর ঋণ

IMF ও বাংলাদেশের ঋণের ক্রমধারা

১৯৭৪ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ IMF থেকে ১১ বার ঋণ গ্রহণ করেছে। ২০০৩ ও ২০১২ সালের ঋণের অর্থ এখনো বকেয়া রয়েছে যথাক্রমে ৯৫৬০৪ (হাজার SDRs), এবং ২৭৪২৬৯ (হাজার SDRs,).

ঋণ গ্রহণের সময়	ঋণ পরিশোধের সময়সীমা	ঋণের পরিমাণ (হাজার SDRs)	বকেয়া অর্থের পরিমাণ(হাজার SDRs)
জুন, ১৯৭৪	জুন, ১৯৭৫	৩১২৫০	০
জুলাই, ১৯৭৫	জুলাই, ১৯৭৬	৬২৫০০	০
জুলাই, ১৯৭৯	জুলাই, ১৯৮০	৮৫০০০	০
ডিসেম্বর, ১৯৮০	জুন, ১৯৮২	২২০০০০	০
মার্চ, ১৯৮৩	আগষ্ট, ১৯৮৩	৬৮৪০০	০
ডিসেম্বর, ১৯৮৫	জুন, ১৯৮৭	১৮০০০০	০
ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭	ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০	২০১২৫০	০
আগস্ট, ১৯৯০	সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩	৩৩০০০০	০
জুন, ২০০৩	জুন, ২০০৭	৩১৬৭৩০	৯৫৬০৪
এপ্রিল, ২০১২	এপ্রিল, ২০১৫	২৭৪২৬৯	২৭৪২৬৯

IMF এর ঋণ

সাম্প্রতিক ঋণ

২৪ জুলাই, ২০২২ সালে বাংলাদেশে IMF কে ঋণ সহায়তার জন্য চিঠি পাঠায়। অনেক হিসাব-নিকাশ ও দ্বিপাক্ষিক আলোচনা পর্যালোচনা শেষে বাংলাদেশকে ৪৭০ কোটি ডলার ঋণ দিতে সম্মত হয়েছে IMF। সাত কিস্তিতে IMF এ ঋণ ছাড় করবে। যার প্রথম কিস্তির পরিমাণ ৪৭৬.২৭ মিলিয়ন ডলার। বাকি ঋণ প্রতি ছয় মাস পরপর সমান ছয়টি কিস্তিতে ২০২৬ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বুঝে পাবে বাংলাদেশ। ঋণের সুদের হার নির্ধারিত না, সুদ হার হবে পরিবর্তনশীল। তবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের হিসাব মতে গড় সুদ হার হবে ২.২ শতাংশ। IMF বাংলাদেশকে এ ঋণ দিয়েছে ৩টি ক্যাটাগরিতে।

- ✓ Extended Credit Facility (ECF)- এর আওতায় ১১৫ কোটি ডলার।
- ✓ Resilience and Sustainability Facility (RSF)- এর আওতায় ১৪০ কোটি ডলার।
- ✓ Extended Fund Facility (EFF) – ২১৫ কোটি ডলার।

[তথ্যসূত্র: The Daily Star]

এই ঋণের সুদসহ সর্ম্পূণ অর্থ ১০ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। যদি ১০ বছরের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে বাংলাদেশ ব্যর্থ হয়, তাহলে নির্ধারিত গ্রেস পিরিয়ড পার হয়ে যাওয়ার পর বাংলাদেশকে জরিমানা করা হবে, যা বাধ্যতামূলক পরবর্তী ২০ বছরের মধ্যে আসলসহ পরিশোধ করতে হবে।

IMF এর ঋণ

IMF এর ঋণের শর্ত

কোনো রাষ্ট্রকে ঋণ দেওয়ার পূর্বে IMF সে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা, ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা (Credit rating history) অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও কাঠামো পর্যালোচনা করে থাকে। পর্যালোচনা করে যুক্তিসঙ্গত হলেই IMF ঋণ দেয়। আর এ ঋণ দেওয়ার পূর্বে ঋণ গ্রহীতা রাষ্ট্রকে কিছু শর্ত ও সংস্কারের নির্দেশ দিয়ে থাকে।

Structural Adjustment Program (SAP) হলো IMF ঋণ প্রদানের জন্য যেসব শর্ত প্রদান করে থাকে তার সমষ্টি। IMF সাধারণত দুই ধরনের শর্ত দেয়। একটি সহজ শর্ত (soft condition) যেগুলো পূরণ করার তেমন বাধ্যবাধকতা নেই এবং পূরণ না করলে IMF কোনো পদক্ষেপ নেয় না। দ্বিতীয়টি হলো কঠিন শর্ত বা hard condition. ঋণ গ্রহীতার জন্য hard condition অবশ্যই মেনে চলতে হয়, না মানলে IMF পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

IMF এর সহজ শর্ত (soft condition)	IMF এর বা কঠিন শর্ত (Hard Condition)
• দুর্নীতি রোধ করা। • সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। • গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। • আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। • মানবাধিকার আইন মান্য করা ইত্যাদি।	• মুদ্রানীতি আধুনিক করা/ বিনিময় মূল্য বাজারের উপর ছেড়ে দেওয়া। • রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কার করা। • সামষ্টিক অর্থনীতির দুর্বলতাগুলো সংস্কার করা। • বাজার উদারীকরণ করা/ বাজারে হস্তক্ষেপ না করা। • জ্বালানি খাত বেসরকারিকরণ করা। জ্বালানি খাতে সরকারি ভর্তুকি প্রদান বন্ধ করা।

বাংলাদেশকেও IMF উল্লিখিত শর্তগুলো প্রদান করেছে।

IMF এর ঋণ

IMF এ ঋণ আবেদনের বাস্তবতা

২০২২ সালে IMF থেকে ঋণ নেওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার যে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা কতটা বাস্তব সম্মত তা পরখ করার জন্য কিছু ঘটনার উপস্থাপন জরুরি–

- **করোনা মহামারি:** ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ সালে চীনের উহান থেকে শুরু হয় করোনা ভাইরাসের যাত্রা যা কয়েক মাসের মধ্যে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে আঘাত হানে ৮ মার্চ, ২০২০ সালে। করোনা মহামারির কারণে বিশ্ব অর্থনীতি যেমন স্থবির হয়ে পড়ে তেমনি বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রগতিও কমতে থাকে। বাংলাদেশের GDP, GNI, মাথাপিছু আয় পূর্বের তুলনায় অনেক কমে যায়। দারিদ্র্যের হার ১৫% এ নামিয়ে আনার কথা থাকলেও ২০২২ পর্যন্ত তা ২০.৫% এ স্থির রয়েছে, প্রবাসী আয়ও কমে গেছে। সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটা সংকট সৃষ্টি করেছে করোনা মহামারি।

- **রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ:** এ যুদ্ধের কারণে গত এক বছর যাবৎ বিশ্ব অর্থনীতিতে অস্থিরতা বিরাজ করছে। বিশ্ব আমদানি রপ্তানির অন্যতম কেন্দ্র হলো রাশিয়া ও ইউক্রেন। বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে রাশিয়া খাদ্যশস্য, সার, ভোজ্য তেল, গ্যাস ও জ্বালানি তেল রপ্তানি করতে পারছে না, ফলে বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশেও এ যুদ্ধের প্রভাব লক্ষণীয়।

IMF এর ঋণ

- **বাণিজ্য ঘাটতি:** আন্তর্জাতিক বাজারে সবকিছুর দাম বৃদ্ধিসহ পরিবহণ খরচও বেড়েছে ব্যাপক হারে। তাই বাংলাদেশের আমদানিতে নাটকীয় উত্থান হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১১ মাসে আমদানি বৃদ্ধি আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৩৯ শতাংশ। এ বছরের মে মাসে এসে বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়ায় ২ হাজার ৮২৩ কোটি ডলার।

- **মূল্যস্ফীতি:** চলমান রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ দেশের অর্থনীতিতে নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে। ডলার সংকটের কারণে টাকার মূল্যের পতন ঘটছে ব্যাপক হারে। ২০২১ সালের জুন-জুলাইয়ের দিকে ১ ডলার সমান ৮৫-৮৬ টাকা ছিল কিন্তু বর্তমানে তা বেড়ে ১০৫ টাকাতে পৌঁছেছে। IMF বলছে বাংলাদেশের বর্তমান মূল্যস্ফীতির হার ৮.৮ যা ২০২৩ সালে বেড়ে ৯.১% হতে পারে।

- **জ্বালানি সংকট:** বাংলাদেশ জ্বালানি আমদানিকারক দেশ। বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকটের কারণে বাংলাদেশের জ্বালানি আমদানিতে পড়েছে ভাটা, জ্বালানি তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। আর জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির কারণে প্রভাব পড়ছে কৃষি, শিল্প ও পরিবহণ খাতে।

IMF এর ঋণ

- **চলতি হিসাবের ঘাটতি:** বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি হলো– প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ। করোনা মহামারি ও যুদ্ধের কারণে বাংলাদেশের প্রবাসী আয় কমেছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রবাসী আয় ছিল ২৪.৭৫ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে কমে হয় ২২.০৩ বিলিয়ন ডলার। এ কারণে বাংলাদেশের মোট আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হয়ে গেছে যার কারণে চলতি হিসাবে ঘাটতি বাড়ছে।

উপর্যুক্ত পরিস্থিতিগুলো মোকাবিলা করার জন্য বাংলাদেশের ঋণের কোনো বিকল্প নেই। তাই সামগ্রিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা সাপেক্ষে IMF এর কাছ থেকে ঋণ চাওয়ার ব্যাপারটাকে অর্থনীতিবিদরা ইতিবাচকভাবে দেখেছেন। কারণ চলমান এবং আসন্ন অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব মোকাবিলায় এই মুহূর্তে বাণিজ্য ঘাটতিকে সহনশীল পর্যায়ে নিয়ে আসার এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে স্থিতিশীল করার জন্য বাংলাদেশের কাছে আপাতত ঋণের বিকল্প নেই।

IMF এর ঋণ

করণীয়/সুপারিশ সমূহ

- ✓ IMF এর নির্দেশনা অনুযায়ী বেসরকারিকরণ ও ঋণ পরিশোধ শিথিল (Loan repayment relaxation) করতে হবে।
- ✓ IMF ভর্তুকি কমানোর কথা বলছে। কিন্তু কোন কোন খাতে ভর্তুকি কমানো যেতে পারে তা রাষ্ট্রকেই নির্ধারণ করতে হবে। উন্নয়নশীল দেশ হওয়ায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের মানুষের কথা চিন্তা করে ভর্তুকি কমাতে হবে।
- ✓ কাঠামোগত সমন্বয় করতে হবে। অর্থাৎ সরকারি ব্যয় হ্রাস, ভর্তুকি হ্রাস, করের হার পরিবর্তন ও পরিধি বৃদ্ধি, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান লসে থাকলে ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়া ইত্যাদি।
- ✓ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি। প্রতিবছর দুইবার মুদ্রানীতি প্রণয়ন করা। ডলারের মূল্য স্থির না ধরে বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মূল্য নির্ধারণ করা।
- ✓ গৃহীত ঋণের অর্থ উৎপাদনমুখী খাতে বিনিয়োগ করা ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

পরিশেষে বলা যায়, IMF থেকে ঋণ নিয়ে একটি রাষ্ট্র তখনই সফল হয় যখন সে রাষ্ট্রটি নিজের স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দেয়। IMF এর শর্তের মাঝে থেকেই বাংলাদেশকে ঋণের অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তাই IMF থেকে বাংলাদেশ যে শর্তে ঋণ নিয়েছে সেখানে বাংলাদেশকে কূটনৈতিক ও অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় স্বার্থের প্রধান্য বেশি দিতে হবে।

LDC

ভূমিকা

উন্নয়নশীল বিশ্বে বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য ECOSOC ১৯৬৪ সালে UNCTAD গঠন করে। ১৯৬৪ সালেই UNCTAD আবার G-77 গ্রুপ গঠন করে যার সদস্যগুলো মূলত উন্নয়নশীল ৭৭টি দেশ। ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ G-77 ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যে পিছিয়ে পড়া দেশগুলোকে LDC তালিকাভুক্ত করে। স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ LDC ভুক্ত হয়।

LDC থেকে উত্তরণ

১৬ মার্চ, ২০১৮ সালে CDP তাদের ২০তম সভায় ঘোষণা করে যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশকে এর চূড়ান্ত ঘোষণা পেতে হলে ২০২৬ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং পরপর ৩ ধাপে উত্তরণের শর্ত গুলো ধরে রাখতে হবে।

LDC থেকে উত্তরণের শর্ত:

সূচক/LDC থেকে মুক্ত হওয়ার শর্ত	CDP শর্ত	বাংলাদেশের অর্জন	
		২০১৮	২০২১
গড় মাথাপিছু আয় (GNI)	১২৩০ ডলারের বেশি (২০২১ সালে নতুন মানদণ্ড ১২২২ ডলারের বেশি)	১২৭৪ ডলার	১৮২৭ ডলার
মানব সম্পদ সূচক (HAI)	৬৬ বা তার বেশি	৭৫.২	৭৫.৩
অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক (EVI)	৩২ বা তার কম	২৫.২	২৭.২

[তথ্যসূত্র : United Nationas: Department of Economic and Social Affairs]

LDC

বাংলাদেশ LDC থেকে উত্তরণের প্রথমবার শর্ত পূরণ করে ২০১৮ সালে। জাতিসংঘের CDP ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্ধারণ করে যে বাংলাদেশ দ্বিতীয় বারের মতো স্বল্পোন্নত দেশের (LDC) বিভাগ থেকে স্নাতক হওয়ার জন্য ৩টি প্রয়োজনীয় শর্ত আবারো পূরণ করতে সমর্থ হয়েছে। একটি দেশকে LDC উত্তরণের জন্য পরপর ৩বার শর্ত পূরণের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে। বাংলাদেশ ২০১৮, ২০২১ পরপর দুইবার সক্ষম হয়েছে। ২০২৪ সালে ৩য় বার সফল হতে হবে। যার ফলে ২০২৬ সালে চূড়ান্ত ছাড়পত্র পাবে এবং ২০২৭ সাল থেকে LDC ভুক্ত দেশের সকল সুবিধা বাংলাদেশ হারাবে।

তিনটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের শক্তিশালী পারফরম্যান্স তার অর্থনৈতিক শক্তি ও স্থিতিস্থাপকতা প্রদর্শন করে। এমনকি COVID-19 মহামারির সময়েও বাংলাদেশ সবগুলো শর্ত পূরণে সক্ষম ছিল। ফলস্বরুপ, দেশটি ২০২৬ সালের নভেম্বরে LDC মর্যাদা থেকে উন্নয়নশীল দেশ হতে চলেছে।

চ্যালেঞ্জ সমূহ

নভেম্বর, ২০২৬ বাংলাদেশ LDC থেকে মুক্ত হয়ে উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণ করলে অনেকগুলো সুবিধা হারাবে এবং কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে —

- GSP সুবিধা, কোটা সুবিধা ও শুল্ক সুবিধা হারানোর ফলে বাংলাদেশ তার বার্ষিক রপ্তানি আয়ের ১৪% বা ৫.৭৩ বিলিয়ন ডলার হারাতে পারে।
- পোশাক খাতের বাজার একসেস (Access) হারানোর ফলে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। ধারণা করা হচ্ছে পোশাক রপ্তানি ৮-১০% কমে যাবে।
- LDC থেকে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশ আর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধীনে LDC নির্দিষ্ট বিশেষ সুবিধাগুলো বা ডিফারেনশিয়াল ট্রিটমেন্টের জন্য যোগ্য হবে না।
- ২০২৭ সাল থেকে বাংলাদেশে আর Soft Loan বা স্বল্প সুদের ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবে না। ঋণের জন্য বাংলাদেশকে কমপক্ষে ২.২৬% সুদে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।
- বাংলাদেশ Green Climate Fund এর মতো বিশেষ তহবিল হতে অর্থ পাবে না। ফলে জলবায়ুর পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান বিপদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্থিতিস্থাপকতা কমে যাবে। যেহেতু বাংলাদেশ জলবায়ু বিপর্যয়ের দ্বারা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির মধ্যে একটি হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, সুতরাং GCF হারানো একটি বড় ধাক্কা হতে পারে।
- জাতিসংঘের প্রযুক্তি ব্যাংক স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে টেকসই উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে সহায়তা দিয়ে থাকে। উন্নয়নশীল দেশের ক্যাটাগরিতে চলে গেলে তারা বাংলাদেশকে আর সহায়তা করবে না।
- স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে জাতিসংঘে বাংলাদেশের চাঁদার পরিমাণ খুবই কম কিন্তু উন্নয়নশীল দেশের ক্যাটাগরিতে চলে গেলে বাংলাদেশের প্রদেয় চাঁদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

LDC থেকে উত্তরণের সুবিধা

LDC থেকে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পাশাপাশি কিছু সুবিধাও পাবে—

- ✓ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পাবে। ফলস্বরুপ, দেশের ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ইতিবাচক সংকেত পাবে এবং সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) বৃদ্ধি পাবে।
- ✓ সুদের হার বাড়লেও উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বৈদেশিক ঋণ পাওয়া সহজ হবে এবং ব্যবসায়ীদের LC (Letter of Credit) নিশ্চিতকরণের খরচ বিদেশি ব্যাংকগুলি কমিয়ে দেবে।
- ✓ বিনিয়োগ বৃদ্ধির কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। সরকারের ভ্যাট, ট্যাক্স এবং রাজস্ব আদায়ও বাড়বে।

সম্ভাব্য সমাধান/সুপারিশসমূহ

উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার জন্য যে সুপারিশগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে—

- ✓ আমাদের কর জিডিপি অনুপাত ৭.৫ শতাংশ যা এখনও তুলনামূলকভাবে কম। প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা কর সংগ্রহকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারি।
- ✓ মানি লন্ডারিং করে দেশের অর্থ বিদেশে পাচার করা হচ্ছে। আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে মানি লন্ডারিং বন্ধ করা হয়েছে এবং এর জন্য দায়ীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।
- ✓ GSP সুবিধা হারানোর বিপরীতে FTA, PTA, MFN (Most favored Nation), GSP Plus সুবিধা ইত্যাদি গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ✓ FDI বাড়ানোর জন্য কূটনৈতিক মিশনগুলোকে প্রতিটি দেশে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে তুলে ধরতে হবে।

LDC

- ✓ যেহেতু বাংলাদেশ Copy right সুবিধা হারাবে সেহেতু Digital Economy, উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- ✓ বাংলাদেশের ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে ভারত, চীন, জাপান ও কোরিয়ার পাশাপাশি অন্যান্য দেশগুলোকেও বিনিয়োগে আকৃষ্ট করা যেতে পারে।
- ✓ বাংলাদেশ ২০১২ সালে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এ প্রবেশ করেছে যা ২০৪০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এই সময়ে বাংলাদেশ তার জনশক্তিকে সর্বোচ্চ কাজে লাগাতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণের ফলে বাংলাদেশ অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে দিয়ে যাবে। আর এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশকে প্রতিটি সেক্টরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। UNCTAD এর সর্বশেষ রিপোর্টে বলা হয়েছে স্বচ্ছতার মাধ্যমে ৮০% বাণিজ্য সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আন্তর্জাতিক মানের পোশাক রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশ তার বিদেশি ক্রেতা ধরে রাখতে পারে এবং উন্নয়নশীল দেশের পথযাত্রায় এগিয়ে যেতে পারে।

রাশিয়া-ইউক্রেন ইস্যু

রাশিয়া-ইউক্রেন ইস্যু

ভূমিকা

সাম্প্রতিক সময়ে ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক আগ্রাসন পুরো বিশ্ব ব্যবস্থাকেই বড় একটি ধাক্কা দিয়েছে। অনেক বিশ্লেষক স্নায়ুযুদ্ধের পর এটিকেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সবচেয়ে প্রভাবশালী ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করে বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় বড় ধরনের প্যারাডাইম শিফট আনবে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশ একটি দ্রুত উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে সারা বিশ্বের সাথে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কে আবদ্ধ। রাশিয়া- ইউক্রেন যুদ্ধে বাংলাদেশ একই সাথে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও পদক্ষেপ গ্রহণের বিকল্প নেই।

সমস্যার প্রেক্ষাপট

রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে একটি চলমান ও দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত হলো রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, যা ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু হয়েছিল। ২০১৪ সালে রাশিয়া ইউক্রেনের ক্রিমিয়া দখল করে নেয়। মূলত তখন থেকেই নিজেদের ভূখণ্ড রক্ষা করার জন্য ইউক্রেন NATO ও EU ভুক্ত হতে চাচ্ছিল। ২০২২ সালে ইউক্রেন NATO তে যোগ দেওয়ার তাগিদ জোরালো করলে রাশিয়া ক্ষেপে উঠে। ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ সালে রাশিয়া ইউক্রেনে সামরিক আগ্রাসন চালায় এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকে জাগিয়ে তোলে। এই যুদ্ধে ইউক্রেনকে সমর্থন দিচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র ও NATO মিত্ররা অন্যদিকে রাশিয়া একাই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ ও নিষেধাজ্ঞার মধ্যে দিয়ে চলছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের বর্তমান অবস্থা। ইতোমধ্যে রাশিয়া গণভোটের মাধ্যমে ইউক্রেনের লুহানস্ক, দোনেৎস্ক, খেরসন ও জাপোরিঝঝিয়া দখলে নিয়েছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন ইস্যু

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে বাংলাদেশের সমস্যা

রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ তাদের জাতীয় অর্থনীতিকে ছাড়িয়ে বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলছে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বাংলাদেশের দুটি ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলছে –

✓ কূটনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব ✓ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব

কূটনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব: ২৪ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ রাশিয়া ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার সামরিক অভিযান শুরু করার পর ২৫ শে ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়াকে নিন্দা জানিয়ে প্রস্তাব আনা হয়। অনুমিতভাবে রাশিয়ার ভেটোর কারণে তা গৃহীত না হলে সেটা সাধারণ পরিষদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ৩ মার্চ রাশিয়ার অভিযানকে সামরিক আগ্রাসন হিসেবে অ্যাখ্যা দিয়ে অবিলম্বে ইউক্রেন থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে করা প্রস্তাব ১৯১টি দেশের মধ্যে ১৪১-৫ ভোটে পাশ হয়। যে ৩৫টি দেশ ভোট দানে বিরত থাকে তাদের একটি হলো বাংলাদেশ। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ বেশ কিছু নীতি নির্ধারণ পর্যায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বাংলাদেশের এই অবস্থানকে নীতিগত নয় বরং বাংলাদেশের স্বার্থের কথা চিন্তা করে নেওয়া বলে উল্লেখ করেন।

রাশিয়া-ইউক্রেন ইস্যু

তবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞরা অতীতে বাংলাদেশের একই ধরনের পরিস্থিতি যেমন ভিয়েতনামের ১৯৭৯ সালে কম্বোডিয়ার আক্রমণ, ১৯৮০ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসন, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার পক্ষে প্রস্তাব ও ২০০১ সালে আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার নিন্দা জানিয়ে আনা প্রস্তাবগুলোতে বাংলাদেশের সর্বদা সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার পক্ষে মতামত দেওয়ার ইতিহাস দেখিয়ে বলছেন, ইউক্রেনের স্বার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার প্রশ্নে বাংলাদেশের নীরবতা তার বৈদেশিক বিনিয়োগ, রপ্তানি গন্তব্য ও উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী দেশসমূহ (ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, জাপান, অস্ট্রেলিয়া) বাংলাদেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

যুদ্ধ আরো দীর্ঘায়িত হলে এসকল দেশসমূহ নিশ্চিতভাবেই জাতিসংঘে ভবিষ্যতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আরো প্রস্তাব ও কূটনৈতিক শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিবে। তখন হয়তো এ প্রশ্নে নীরব থাকা বাংলাদেশের স্বার্থের জন্য অনুকূল নাও হতে পারে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশকে কূটনৈতিকভাবে কোন পক্ষ অবলম্বন করবে তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। সরাসরি রাশিয়ার বিরোধিতা না করলে পশ্চিমাদের রোষানলে পড়তে হতে পারে। আবার পশ্চিমাদের সাথে সরাসরি রাশিয়ার বিরোধিতায় নামলে রাশিয়া ও তার মিত্র চীন, ভারত ইত্যাদি দেশ এ নিয়ে কী প্রতিক্রিয়া জানাবে তা পরিষ্কার নয়। অর্থাৎ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে বাংলাদেশ কোন পক্ষে অবস্থান করবে তা নিয়ে একটি কূটনৈতিক সমস্যায় আছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন ইস্যু

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব : বাংলাদেশ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আঁচ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভালো ভাবেই লেগেছে। এই যুদ্ধ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দিয়েছে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র আয়তনের দেশ হওয়ায় শিল্প, জ্বালানি ও তথ্য প্রযুক্তিসহ নানা খাদ্য শস্যের জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। আর এসব পণ্যের সিংহভাগ রপ্তানি করে রাশিয়া ও ইউক্রেন। নিচে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতির চিত্র তুলে ধরা হলো –

- **আমদানি খরচ বৃদ্ধি:** বিশ্বজুড়ে উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে টাকার মূল্য ডলারের তুলনায় অনেক কমে গেছে। পূর্বে যেখানে ১ ডলার সমান ৮৪-৮৫ টাকা ছিল এখন তা ১০৫ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। ফলে বাংলাদেশের আমদানি খরচ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি:** বিশ্বজুড়ে খাদ্যশস্যের বাজার অস্থির হয়ে উঠছে। দাম প্রতিদিনই বাড়ছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর মানুষ এখন দিশেহারা। কারণ বাংলাদেশ অনেক পণ্যই সরাসরি রাশিয়া ও ইউক্রেন থেকে আমদানি করে থাকে। যেমন- গম, সূর্যমূখী তেল, ভুট্টা, সরিষা, তুলা, জ্বালানি তেল, গ্যাস, সার ইত্যাদি।
- **বাণিজ্যে প্রভাব:** রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের রয়েছে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ রাশিয়া থেকে মোট আমদানি করে ৪৬.৪৭ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য। অপরপক্ষে রপ্তানি করে মোট ৬৬.৫৩ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য। যেখানে ২০২০-২১ অর্থবছরে রাশিয়া থেকে মোট আমদানি ছিল ৬২.৯ কোটি ডলার, রপ্তানি ছিল ৭৩.৮ কোটি ডলার।

রাশিয়া-ইউক্রেন ইস্যু

- **জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি:** রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি তেলের দাম হুহু করে বাড়ছে। জ্বালানি তেলের আমদানি ব্যয় মেটাতে এখন হিমশিম খাচ্ছে বাংলাদেশ। অর্থনীতিবিদরা বলছেন আসছে বাজেটে জ্বালানির জন্য ভর্তুকি রাখতে হবে। অন্যথায় তেলের দাম বাড়াতে হবে আর তেলের দাম বাড়লে দ্রব্যমূল্যের দাম আরো বাড়বে।

- **হাঁস মুরগি ও গরুর খাবার:** পোল্ট্রি ফিড উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো গম ও ভুট্টা। রাশিয়া ও ইউক্রেন গম ও ভুট্টা উৎপাদনে শীর্ষে। সেজন্য বিশ্বজুড়ে পোল্ট্রি ফিড এর দাম বেড়েছে।

- **সার আমদানি:** সিংহভাগ সার আসে রাশিয়া ও বেলারুশ হতে। রাশিয়ার উপর রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে বাংলাদেশ রাশিয়া থেকে সার আমদানি করতে পারছে না।

রাশিয়া-ইউক্রেন ইস্যু

➢ **বাংলাদেশের রিজার্ভ ঘাটতি:** বাংলাদেশ আমদানি নির্ভর দেশ। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে প্রতিনিয়ত বাড়ছে আমদানি খরচ। এ খরচ নির্বাহের জন্য রিজার্ভ থেকে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। যার কারণে রিজার্ভ ঘাটতি দেখা দিয়েছে। গত কয়েক মাসে বাংলাদেশে রিজার্ভ কমে যাওয়ার চিত্র তুলে ধরা হলো-

সময়	রিজার্ভ (বিলিয়ন ডলার)
আগস্ট, ২০২১	৪৮.৪৩
মার্চ, ২০২২	৪৪.০০
ডিসেম্বর, ২০২২	৩৩.০৪
মার্চ, ২০২৩	২৭.০৮

[তথ্যসূত্র: IMF]

রাশিয়া-ইউক্রেন ইস্যু

➢ **মূল্যস্ফীতি:** রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতিতে প্রভাব ফেলেছে যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে বাজারের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর। নিচে কয়েক মাসের মূল্যস্ফীতি চিত্র দেখানো হলো-

মাস	মূল্যস্ফীতি
জানুয়ারি, ২০২২	৫.৫৬%
মার্চ, ২০২২	৬.২২%
জুলাই, ২০২২	৭.৫৬%
সেপ্টেম্বর, ২০২২	৮.৭%
নভেম্বর, ২০২২	৯.১%
মার্চ, ২০২৩	৯.৩%

[তথ্যসূত্র: IMF]

রাশিয়া-ইউক্রেন ইস্যু

- **প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধা:** রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ নির্মাণে রাশিয়ার রয়েছে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তা। যুদ্ধের কারণে রাশিয়াকে সকল ধরনের আন্তর্জাতিক লেনদেন থেকে SWIFT বহিষ্কার করেছে। যার ফলে প্রকল্প সহায়তা মূলক কাজে রাশিয়া জড়িত হতে পারছে না।

- **পোশাক শিল্পে প্রভাব:** বাংলাদেশ থেকে রাশিয়ায় ৬৫০ মিলিয়ন ডলারের বেশি পোশাক রপ্তানি করা হয়। রাশিয়ার ব্যাংক গুলোকে SWIFT থেকে বহিষ্কার করার জন্য অর্থ লেনদেন করা যাচ্ছে না। যার কারণে প্রতি মাসে অনেক ক্রয় আদেশ প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন ইস্যু

সমস্যা সমাধানে সুপারিশসমূহ

➢ কূটনৈতিক

✓ **বিশেষজ্ঞ কূটনৈতিক দল গঠন:** বাংলাদেশে বর্তমানে কর্মরত রাষ্ট্রদূত ও কূটনৈতিকদের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, কূটনৈতিক বিষয়াবলি ও এ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে স্পেশাল টাস্কফোর্স তৈরি করে বিশেষ পরিস্থিতিতে উদ্ভূত সংকট মোকাবিলায় সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে নিয়োজিত করা যেতে পারে।

✓ **বিদেশি লবিং এজেন্সি নিয়োগ:** বৈশ্বিক পর্যায়ে বিভিন্ন সংকটে শক্তিশালী পক্ষগুলোর সাথে সর্বদা সুসম্পর্ক বজায় রাখতে ও বিভিন্ন দর কষাকষিতে নিজেদের পক্ষে ফলাফল আনতে শক্তিশালী লবিয়েস্ট এজেন্সি নিয়োগ করা যেতে পারে।

✓ **আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা:** বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয়ভাবে সংঘাতরত পক্ষগুলোর সাথে সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখতে কূটনৈতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে পারে। এর ফলে আন্তর্জাতিক ফোরামে নিরপেক্ষতা বজায় রাখলেও কারো সাথে সম্পর্ক প্রতিকূল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।

✓ **আঞ্চলিক বৃহৎশক্তিগুলোর সাহায্য নেওয়া:** রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ মূলত বৃহৎ পর্যায়ে মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমাদের সাথে রাশিয়া ও তার সমমনা রাষ্ট্রগুলোর একটি শক্তি প্রদর্শন তথা বিশ্বমানচিত্রে প্রতিপত্তি বাড়ানোর লড়াই। এ অবস্থায় বাংলাদেশ প্রতিবেশী ভারত এর মতো মৈত্রী প্রভাবশালী দেশগুলোর কূটনৈতিক সাহায্য গ্রহণ করতে পারে।

✓ **সমমনা দেশগুলো নিয়ে ঐক্য গঠন:** বাংলাদেশের মতো অন্যান্য সমমনা রাষ্ট্রগুলো যেগুলো পরাশক্তিদের রেষারেষিতে না গিয়ে নিজেদের উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতে চায় তাদের সাথে বসে যৌথভাবে এধরনের পরিস্থিতিতে করণীয় নির্ধারণ করতে পারে।

রাশিয়া-ইউক্রেন ইস্যু

➢ অর্থনৈতিক

- ✓ বাংলাদেশ রাশিয়া ও ইউক্রেনে যে পণ্যগুলো রপ্তানি করে সেগুলোর জন্য নতুন বাজার অনুসন্ধান করা যেতে পারে যাতে মোট রপ্তানির পরিমাণে প্রভাব না পড়ে।
- ✓ বাংলাদেশে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে সে সব পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে সেগুলো আমদানির জন্য সুলভ মূল্যে কোনো নতুন বিক্রেতার সন্ধান ও অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা যেতে পারে।
- ✓ যুদ্ধের কারণে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি ও টাকার মান অবমূল্যায়নে নিয়ন্ত্রণ করতে বাংলাদেশ ব্যাংক সুদের হার বৃদ্ধি ও অর্থসরবরাহ নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ✓ বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে বাইরে থেকে প্রবাসীদের আরো বেশি রেমিট্যান্স পাঠানোর উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে। এতে করে বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম বৃদ্ধি পেলেও আমদানি করার ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা ঘাটতি হবে না।
- ✓ জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশে সন্ধান প্রাপ্ত তেলের খনিগুলো থেকে নিজেরাই তেল উত্তোলনের সক্ষমতা অর্জনে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

রাশিয়া-ইউক্রেন ইস্যু

- ✓ রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্রে রাশিয়ার অর্থায়ন যেন বন্ধ না হয় সেজন্য রাশিয়ার ব্যাংকগুলোর সাথে বিকল্প লেনদেনের উপায় চালু রাখার উদ্যোগ নিতে হবে।
- ✓ দেশের খাদ্য মজুদ ও সরবরাহ ব্যবস্থা জোরদার করা যেতে পারে যাতে এরকম আন্তর্জাতিক সংকট বাংলাদেশ সহজে মোকাবিলা করতে পারে।
- ✓ ডলারের বিপরীতে টাকার দাম স্থিতিশীল রাখতে দেশে বিনিয়োগ ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা যেতে পারে।

উপসংহার: যুদ্ধ মানব সভ্যতার জন্য অভিশাপস্বরূপ। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তিই হলো সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা ও সকল প্রকার শত্রুতাপূর্ণ আচরণ পরিহার করা। সেদিক থেকে চিন্তা করলে বাংলাদেশের বর্তমান নীরব ও নিরপেক্ষ অবস্থান যুক্তিযুক্তই কিন্তু কতদিন এই নিরপেক্ষতা ধরে রাখা যাবে সেটাই কূটনীতিবিদদের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। পাশাপাশি অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা ও নির্ভরশীলতা কমিয়ে এনে অর্থনীতিতে যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব লাঘব করা যেতে পারে।

জোট দ্বন্দ্বে বাংলাদেশ

সাম্প্রতিক সমস্যা

১৯৭১ সালে স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য। বাংলাদেশ তার ভূ-রাজনৈতিক কৌশলের কারণে কোনো বৃহৎ বেসামরিক জোটে অন্তর্ভুক্ত হয় না বা অন্তর্ভুক্ত হতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ভারত, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের জোট গঠনে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে যা বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক কৌশলকে সংকটে ফেলেছে। নিম্নে কিছু ঘটনা তুলে ধরা হলো –

- বর্তমানে বাংলাদেশ চীনের উদ্যোগে গঠিত Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) এর সদস্য। একই রকম আরেকটি সংগঠন Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) যার উদ্যোক্তা যুক্তরাষ্ট্র। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে IPEF এ আমন্ত্রণ জানালে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন "RCEP এর মতো সংগঠনে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হতে চেয়েছে তাদের কেন IPEF এ যেতে হবে।"
- ২০১৫ সালে বাংলাদেশ ও জাপানের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয় BIG-B (The Bay of Bengal Industrial Growth Belt)। কিন্তু সম্প্রতি জাপান জানায় এই BIG-B Project চীন বিরোধী IPS এর অন্তর্ভুক্ত যা বাংলাদেশের জন্য খুবই হতাশাজনক।
- পদ্মাসেতু রেলওয়ে সংযোগ প্রকল্প বাংলাদেশের একান্ত অভ্যন্তরীণ বিষয় হওয়া সত্ত্বেও চীন এ প্রকল্পকে Belt and Road Initiative এর আওতাধীন বলে প্রচার করে যা বাংলাদেশের জন্য হুমকিস্বরূপ।
- ভারত ও জাপান বাংলাদেশকে QUAD এ আমন্ত্রণ জানালে চীনা রাষ্ট্রদূত Li Jiming বলেন "বাংলাদেশের QUAD এর মতো ছোট একটি সংগঠনের সদস্য হওয়া উচিত নয়। এটি চীন ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতি ঘটাবে"।
- QUAD এর বিপরীতে চীন Trans-Himalayan Multi-Dimensional Network গঠন করছে এবং বাংলাদেশকে এই জোটে অন্তর্ভুক্ত করতে পরোক্ষ চাপ প্রদান করছে।

জোট দ্বন্দ্বে বাংলাদেশ

সমস্যার প্রভাব

বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে চীন ও ভারত থেকে আর সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে যুক্তরাষ্ট্রে। চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীত মনোভাব বাংলাদেশকে দুই ভাবে প্রভাবিত করবে।

- ✓ কূটনৈতিকভাবে
- ✓ অর্থনৈতিকভাবে

- ➢ **কূটনৈতিক প্রভাব :** চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীত মেরুতে চলার কারণে বাংলাদেশকে কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকবার ভাবতে হচ্ছে যেমন: বাংলাদেশ QUAD কিংবা IPEF এ যোগদান করবে কী করবে না, যোগদান করলে চীন ব্যাপারটা কেমন ভাবে নিবে আবার যোগদান না করলে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে কীভাবে মূল্যায়ন করবে সেটা ভাবার বিষয়। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের জোট দ্বন্দ্বের কারণে বাংলাদেশকে কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে কারণ এই দুই দেশকে এড়িয়ে কোনো দেশই তার পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে পারে না।

জোট দ্বন্দ্বে বাংলাদেশ

- **অর্থনৈতিক প্রভাব:** যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের জোট দ্বন্দ্বে বাংলাদেশ যদি পড়ে যায় আর দক্ষ কূটনীতির পরিচয় যদি বাংলাদেশ দিতে না পারে তাহলে যে ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে –
  - ✓ চীন বিরাগভাজন হলে চীন থেকে আমদানিকৃত পণ্যের দাম বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বিরাগভাজন হলে বাংলাদেশ বৃহত্তম রপ্তানি বাজার হারাবে।
  - ✓ বাংলাদেশের অধিকাংশ উন্নয়ন প্রকল্পগুলো চীনের সহায়তায় করা হচ্ছে কোনো কারণে চীন যদি এগুলো স্থগিত করে দেয় তাহলে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। অন্যদিকে ২০২২ সালে বাংলাদেশের প্রবাসী আয়ের ২য় শীর্ষ দেশ যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে যাওয়া মানে বিভিন্ন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ডেকে আনা। তাই বাংলাদেশকে সতর্কতার সহিত এই দুই দেশের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হবে।
  - ✓ বাংলাদেশ সকল প্রকার ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী আমদানি করে চীন থেকে এবং পোশাক রপ্তানির অন্যতম বাজার হলো যুক্তরাষ্ট্র। দুই দেশের বিরোধে বাংলাদেশ জড়িয়ে গেলে বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি উভয় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

জোট দ্বন্দ্বে বাংলাদেশ

সমস্যা সমাধানে সুপারিশসমূহ

- বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় উদীয়মান শক্তি এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্বে ভারতের পর বাংলাদেশের অবস্থান। তাই বাংলাদেশ যেকোনো জোট বা যেকোনো পক্ষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মিত্র হতে পারে এ কথাটি বাংলাদেশকে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রকে বোঝাতে হবে।
- বাংলাদেশকে বোঝাতে হবে যে, বাংলাদেশের জন্য কোনো পক্ষই একক মিত্র নয়। বাংলাদেশের উন্নয়নে যারা অংশীদার তারা সবাই বাংলাদেশের বন্ধু।
- RCEP এর ১৫টি দেশের ৯টিই IPEF এর সদস্য তাই একই রকম সংগঠন হওয়ায় বাংলাদেশকে IPEF এ যোগদান না করলেও চলবে।
- বাংলাদেশকে বোঝাতে হবে যে তারা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন NAM এর সদস্য তাই সামরিক কোনো কর্মসূচিতে বাংলাদেশ যুক্ত থাকতে পারে না।

জোট দ্বন্দ্বে বাংলাদেশ

- বাংলাদেশকে স্বেচ্ছায় কেউ সাহায্য করে না। হয় ব্যবসা করে না হয় ভূ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে। তাই বাংলাদেশের জোট দ্বন্দ্ব নিয়ে চিন্তার কারণ নেই।
- পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ. কে আব্দুল মোমেন বলেন "সার্বভৌম দেশ হিসাবে বাংলাদেশ তার নিজ দেশের কল্যাণের জন্য নিজেই পররাষ্ট্রনীতি তৈরি করে"- এই নীতির বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।
- "বাংলাদেশ যেকোনো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অবকাঠামোগত সিদ্ধান্ত নিতে ভূরাজনৈতিক বিষয়কে গুরুত্ব দিতে পারে" (সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম।)

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের মতো একটি সার্বভৌম দেশকে কেউ বলে দিতে পারেনা যে, বাংলাদেশ কী করবে আর কী করবে না। বাংলাদেশের স্বার্থ যেখানে জড়িত থাকবে বাংলাদেশ সেখানেই যাবে। অন্য কোনো দেশ বাংলাদেশকে কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারে না এবং বাংলাদেশ তার স্বার্থে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সেটাকে কোনো দেশের পক্ষপাত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাও উচিত নয়।

বিগত বছরের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করুন। **[৪৩তম বিসিএস লিখিত]**
- সাম্প্রতিককালে ভারতের আসাম রাজ্যে সরকারিভাবে তথাকথিত অবৈধ বাংলাদেশী খুঁজে বের করবার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জন্য একটি নীতিপত্র তৈরি করুন। **[৪১তম বিসিএস লিখিত]**
- মিয়ানমার এবং ভারতের সঙ্গে সমুদ্র সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তির ফলে বঙ্গোপসাগরে ব্যাপক অঞ্চল বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের অধীন। এই এলাকায় শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের জন্য একটি নীতিপত্র (Policy Brief) তৈরি করুন। **[৩৮তম বিসিএস লিখিত]**
- ১৯৭১ সনের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বাংলাদেশের ও পাকিস্তানের বেশ কিছু অমীমাংসাকৃত সমস্যা রয়ে গেছে। এর মধ্যে একটি হলো সম্পদ (Assets) ও ধার দেনা (Liability) সংক্রান্ত। সম্প্রতি পাকিস্তান এই বিষয়ে কিছু মতামত প্রকাশ করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা হিসেবে এই সমস্যাটি নিরসনে কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে তা আলোচনা করুন। **[৩৭তম বিসিএস লিখিত]**

বিগত বছরের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

✪ যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যাংক থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরিজনিত সমস্যার সমাধান ও পুনরাবৃত্তি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া সম্পর্কে আলোচনা করুন। [৩৬তম বিসিএস লিখিত]

✪ **সমস্যাটি সমাধান করুন:**

স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ কিছু উন্নত দেশের বাজারে অগ্রাধিকার বাণিজ্য সুবিধা GSP পেয়ে থাকে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে প্রদত্ত GSP সুবিধা স্থগিত করেছে। বাংলাদেশ সরকার কূটনৈতিক পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে উক্ত GSP সুবিধা পুনর্বহালের চেষ্টা করছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে GSP সুবিধা পুনর্বহাল সংক্রান্ত আলোচনায় কী কী বিষয় স্থান পাবে বলে মনে করেন এবং এসব বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরে, আলোচনা করুন। [৩৫তম বিসিএস লিখিত]

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

লেকচার: ১১

টপিক:

সমস্যা সমাধান: প্রত্যার্পন ইস্যু, জেন্ডার ইস্যু, অভিবাসন ও শরণার্থী, জলবায়ু (Blue Economy, Covid-19, বৈশ্বিক মন্দা, রোহিঙ্গা সমস্যা, আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার এবং বাংলাদেশ)

প্রত্যার্পণ ইস্যু

❖ মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ১২ জন আসামীর নাম-

১. সৈয়দ ফারুক রহমান
২. সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান
৩. এ কে এম মহিউদ্দিন
৪. বজলুল হুদা
৫. মহিউদ্দিন আহমেদ
৬. আবদুল মাজেদ
৭. রাশেদ চৌধুরি
৮. নূর চৌধুরী
৯. খন্দকার আব্দর রশীদ
১০. শরীফুল হক ডালিম
১১. রিসালদার মোসলেহউদ্দিন আহমেদ
১২. আজিজ পাশা

❖ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর:

প্রত্যার্পণ ইস্যু

❖ **মৃত্যুদণ্ড থেকে পালিয়ে থাকা আসামীদের অবস্থান:** ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত ১২ আসামীর মধ্যে ৫ জন এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের বাইরে বিভিন্ন স্থানে পলাতক রয়েছেন। এর মধ্যে রাশেদ চৌধুরি ও নূর চৌধুরির অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে জানা গেছে। বাকি ৩ জনের অবস্থান সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকার পুরোপুরি নিশ্চিত নয়।

০১. **রাশেদ চৌধুরি:**

০২. **নূর চৌধুরী:**

০৩. **শরীফুল হক ডালিম:**

০৪ **রিসালদার মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ:**

০৫. **খন্দকার আব্দুর রশীদ:**

পলাতক খুনিদের ফাঁসি হলো না মুজিববর্ষেও

প্রত্যার্পণ ইস্যু

রাশেদ চৌধুরী
যুক্তরাষ্ট্র
রিসালদার মোসলেহউদ্দীন
জার্মানি
মেজর শরিফুল হক ডালিম
স্পেন
অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল খন্দকার আব্দুর রশিদ
পাকিস্তান
নূর চৌধুরী
কানাডা
ক্যাপ্টেন আবদুল মাজেদ
?

প্রত্যার্পণ ইস্যু

❖ **পলাতক খুনিদের ফিরিয়ে আনতে করণীয়**

০১. যুক্তরাষ্ট্রে পলাতক খুনি মহিউদ্দিন আহমেদকে যখন বাংলাদেশ ফিরিয়ে আনে তখন সেখানে ডেমোক্র্যাট দলের প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায় ছিলো। এখন আবার যেহেতু ডেমোক্রেট দলের জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় এসেছেন, বাংলাদেশও সেখানে পলাতক আরেক খুনি রাশেদ চৌধুরী ফিরিয়ে আনার জন্য একই কূটনৈতিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে।

০২. কানাডায় পলাতক নূর চৌধুরীর রাজনৈতিক এসাইলামের আবেদন নাকচ হলেও কানাডায় মৃত্যুদণ্ড নিষিদ্ধ বলে কানাডার সরকার Pre Removal Risk Assessment এর ভিত্তিতে তাকে ফেরত দিচ্ছে না। কেননা তারা জানে নূর চৌধুরীকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠালে তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে, যা তাদের মৃত্যুদণ্ড বিরোধী নীতির সাথে সাংঘর্ষিক। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার কানাডার ফেডারেল আদালতে Pre Removal Risk Assessment পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করতে পারে।

প্রত্যার্পণ ইস্যু

০৩. যেসকল পলাতক খুনিদের অবস্থান নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে না তাদের অবস্থান উদঘাটন করার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

০৪. বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দেশের সরকার পর্যায়ে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

প্রত্যার্পণ ইস্যু

০৫. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও ফোরামে এই পলাতক খুনিদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারটি উপস্থাপন করা যেতে পারে। বিশেষ করে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে এই ইস্যুটি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে যাতে অন্যান্য দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।

➲ পরিশেষে বলা যায়, বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের এতগুলো বছর পরেও খুনিদের প্রাপ্য শাস্তির মুখোমুখি করতে না পারাটা সমগ্র জাতির জন্য একটি লজ্জার ব্যাপার। এক্ষেত্রে যেমন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার করার সুযোগ রয়েছে তেমনি বাংলাদেশের বাইরে বসবাস করা বাংলাদেশি নাগরিকদের নৈতিক দায়িত্ব এই খুনিদের অবস্থান চিহ্নিত করতে বাংলাদেশ সরকারকে সাহায্য করা। মানবতার ঝাণ্ডাধারী দেশসমূহের, মানবতার চরম লঙ্ঘনকারী এই খুনিদের আশ্রয় দেওয়াটা একটি হতাশাজনক দ্বিচারিতা তা বিশ্বের সামনে স্পষ্ট করার সময় এসেছে।

জেন্ডার ইস্যু

❖ **নারীর ক্ষমতায়ন:**

- ❑ নারীর ক্ষমতায়নে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা
- ❑ নারীর ক্ষমতায়নে শেখ হাসিনার ভূমিকা

❖ **জেন্ডার সমতা**

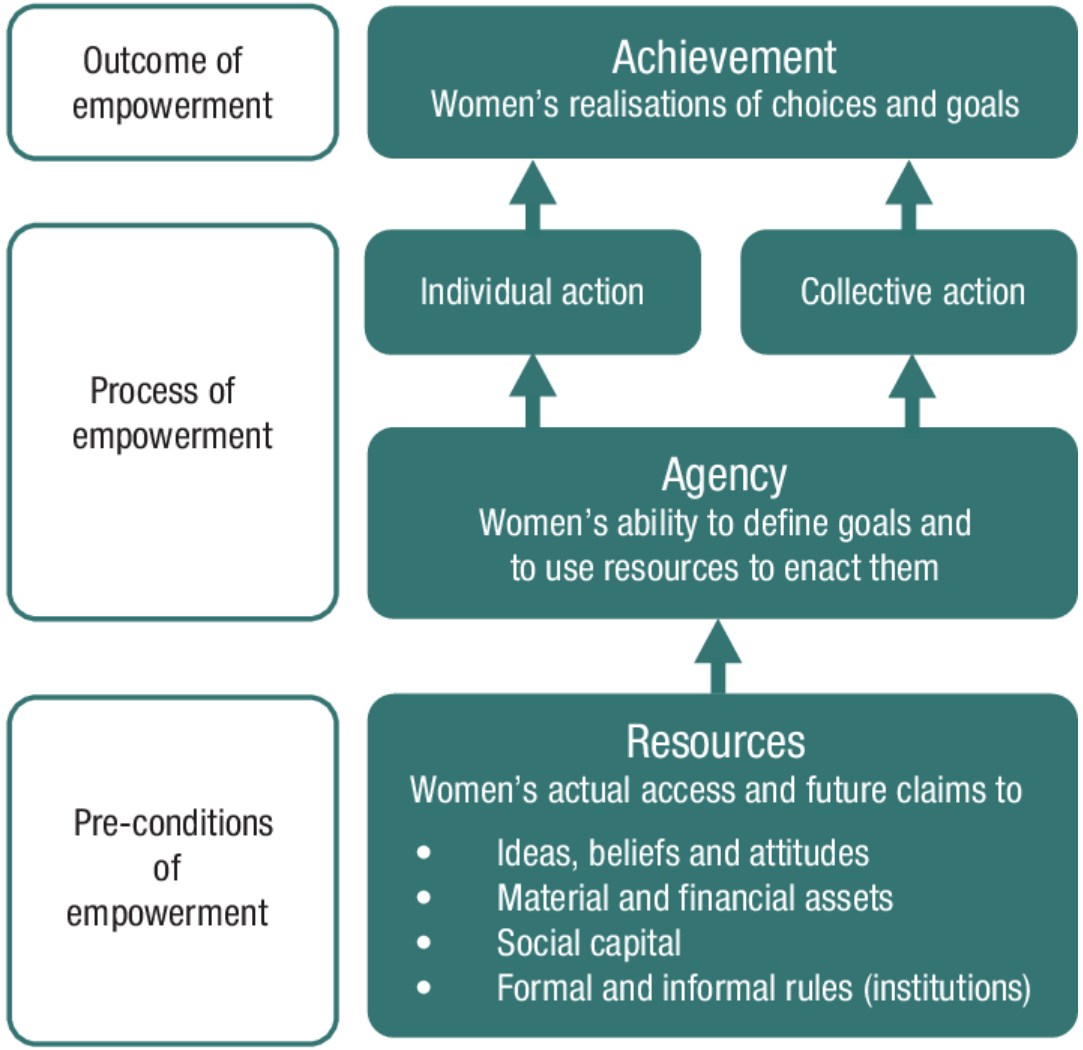

জেন্ডার ইস্যু

❖ জেন্ডার সমতার গুরুত্ব:

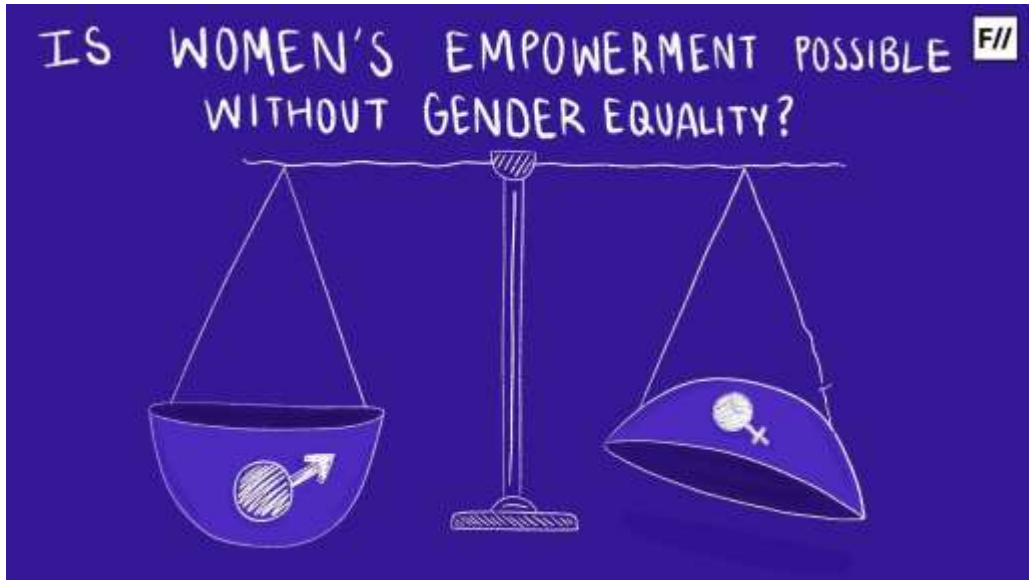

জেন্ডার ইস্যু

❖ নারীর ক্ষমতায়নে আন্তর্জাতিক নানা উদ্যোগ:

- ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘের Economic and Social Council নারীসমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে অধিকার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশমালা প্রণয়ন করে।

- ১৯৫২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নারী সমাজের রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত যে Convention টি গৃহীত হয় তা ছিল- কোনো প্রকার বৈষম্য ছাড়া পুরুষদের অনুররূপ ও সমান মর্যাদা নিয়ে নারীরাও সকল নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন।

- ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন। জাতিসংঘ নারীর রাষ্ট্রীয়, সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালকে "নারী বর্ষ" হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৭৫ সালে প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১৯৭৬-৮৫ সালকে নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। নারী দশকের লক্ষ্য ছিল সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি।

জেন্ডার ইস্যু

- ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর নারীর প্রতি সকল প্রকার 'বৈষম্য নিরোধ সনদ' বা The Convention of the Elimination of all forms of Discrimination Against Women. সনদ গ্রহণ করে, যাতে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য বাস্তবমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।
- ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় নারী সম্মেলন। এতে ১৯৭৬-৮৫ পর্বের নারী দশকের প্রথম পাঁচ বছরের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং নারী দশকের লক্ষ্যের আওতায় আরও তিনটি লক্ষ্য- শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান চিহ্নিত করা হয়।
- ১৯৮৫ সালে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবীতে তৃতীয় বিশ্ব নারীসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং নারী উন্নয়নের জন্য সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির ভিত্তিতে অগ্রমুখী কৌশল গৃহীত হয়।
- ১৯৯৩ সালে বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলনের Vienna Declaration-এ বলা হয়, নারীর অধিকারই মানবাধিকার।

জেন্ডার ইস্যু

❖ **বেইজিং ঘোষণা:** ১৯৯৫ সালের ৪-১৫ সেপ্টেম্বর বেইজিং এ ১১০টির বেশি দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা গহীত হয়। বেইজিং কর্মপরিকল্পনা নারী উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়। ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

- ✓ নারীর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য।
- ✓ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অসম সুযোগ
- ✓ নারী নির্যাতন।
- ✓ নারী উন্নয়নে অপর্যাপ্ত প্রতিষ্ঠানিক অবকাঠামো
- ✓ স্বাস্থ্যসেবার অসম সুযোগ।
- ✓ সশস্ত্র সংঘর্ষের শিকার নারী
- ✓ অর্থনৈতিক সম্পদে নারীর সীমিত অধিকার
- ✓ নারীর মানবাধিকার লংঘন।
- ✓ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্ষমতায় অংশগ্রহণে অসমতা
- ✓ গণমাধ্যমে নারীর নেতিবাচক প্রতিফলন এবং অপ্রতুল অংশগ্রহণ
- ✓ পরিবেশ সংরক্ষণে ও প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর সীমিত আধিকার এবং মেয়ে শিশুর প্রতি বৈষম্য।

জেন্ডার ইস্যু

❖ UN Women:

The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women বা UN Women নামে চালু হয় ২০১১ সালে যা নারীর অধিকার ও লিঙ্গ সমতা নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করে আসছে। UN Women "আন্তর্জাতিক নারী দিবস" পালনে বিশ্বব্যাপী উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছে। এছাড়াও Millennium Development Goals এর ৮টি লক্ষ্যের ৩য় লক্ষ্যটি ছিলো নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করা এবং ৫ম লক্ষ্য ছিলো মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি। ফলে জাতিসংঘ নারী উন্নয়নে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে সেগুলো বাস্তবায়নে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

জেন্ডার ইস্যু

❖ CEDAW:

❖ CEDAW সনদটি মূলত তিনটি প্রেক্ষিত থেকে সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দেয়। যথা:

ক. নারীর নাগরিক অধিকার ও আইনি সমতা নিশ্চিতকরণ, যার মাধ্যমে নারী গণজীবনে ও সমাজে পুরুষের সমপর্যায়ে সব সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

খ. নারীর প্রজনন ভূমিকাকে সামাজিক ভূমিকা হিসেবে গণ্য করা, যাতে প্রজননের কারণে নারীকে কোণঠাসা না করে এক্ষেত্রে নারীর অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

গ. আচার-প্রথা, সংস্কার ও বিধি যা নারীর জেন্ডার ভূমিকা নির্ধারণ করে তা বাতিল করা। পরিবার ও সমাজের মানুষ হিসেবে নারীকে গণ্য করা এবং পুরুষের সমতার ভিত্তিতে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

অভিবাসী, শরণার্থী ও রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী

অভিবাসী (Immigrants)

আভিধানিক অর্থে কেউ বসবাসের উদ্দেশ্যে নিজ দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে এক বছরের বেশি সময় থাকলে তাকে সাধারণ অর্থে অভিবাসী (Immigrant) বলা হয়। মানুষ বিভিন্ন কারণে অভিবাসী হতে পারে। যেমন- উন্নত জীবনের আশা, পড়ালেখা বা পারিবারিক কারণ, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে গৃহত্যাগ, পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি। বর্তমান বিশ্বে প্রায় ১৭ কোটি ৫০ লাখ অভিবাসী আছে, যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩ ভাগ। বর্তমানে সবচেয়ে বেশি অভিবাসী আছে উত্তর আমেরিকায়, যেখানে বছরে অভিবাসী গমনের সংখ্যা ১৪ লাখ এবং ইউরোপে বছরে অভিবাসী হয় ৮ লাখ।

অভিবাসী সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ

- ✓ জাতিসংঘের নাগরিক অধিকার সনদ- ১৯৭৬
- ✓ অভিবাসী শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্য বিলোপের জন্য ১৯৯০ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়েছে অভিবাসী সুরক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশন।
- ✓ Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration নামে ২০১৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘে স্বাক্ষরিত অভিবাসী চুক্তি। ২৩ অনুচ্ছেদ সংবলিত এই চুক্তিটি অভিবাসী সংক্রান্ত শীর্ষ আইন।

অভিবাসী, শরণার্থী ও রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী

শরণার্থী (Refugee)

জীবন বাঁচাতে নিজ দেশ ত্যাগকারীকে শরণার্থী (Refugee) বলে। ১৯৫১ সালের জেনেভা কনভেনশন অনুসারে শরণার্থী তিনি হবেন –

- ✓ যিনি সশস্ত্র লড়াই বা নিপীড়ন থেকে বাঁচতে দেশ থেকে পালিয়ে যান।
- ✓ যিনি দেশ ত্যাগের পরে দেশে ফিরে গেলে জীবন বিপন্ন হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন।
- ✓ যিনি বর্ণবাদ, ধর্ম, জাতীয়তাবাদ, কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ায় নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হন।
- ✓ যিনি স্বেচ্ছায় দেশে ফিরে যেতে ভয়ে থাকেন।

১৯৫১ সালের জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী একজন শরণার্থী গৃহীত রাষ্ট্রে যেসব অধিকার পাবেন-

- ✓ একজন শরণার্থীকে জীবন ও স্বাধীনতার হুমকির মুখে তাড়িয়ে দেয়া যাবে না।
- ✓ সামাজিক আবাসন সুবিধা পাবেন।
- ✓ সামাজিক কল্যাণমূলক সুবিধাগুলো পাবেন।
- ✓ সমাজে মিশে যাওয়ার অধিকার পাবেন।
- ✓ কাজের ব্যবস্থা পাবেন।

রোহিঙ্গা সমস্যা ও বাংলাদেশ

❖ রোহিঙ্গা সমস্যা:

রোহিঙ্গা সমস্যা ও বাংলাদেশ

সংকটের শুরু

১৯৬২ সালে জেনারেল নে উইন সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলে রোহিঙ্গাদের জন্য শুরু হয় দুর্ভোগের নতুন অধ্যায়। ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত 'অপারেশন ড্রাগন কিং' নামক সেনা অভিযানে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালায় বার্মা। বার্মিজ সেনাদের এই নৃশংস আক্রমণে ২.৫ লাখ রোহিঙ্গা পালিয়ে বাংলাদেশে চলে আসে। পরে একটি চুক্তির মাধ্যমে ১.৮ লাখ রোহিঙ্গা মিয়ানমারে ফিরে যায়। রোহিঙ্গারা ১৯৮২ সালের মিয়ানমারের নাগরিকত্ব আইনের কারণে নাগরিকত্ব হারান। ফলে তাদের উপর রাষ্ট্রীয়ভাবে অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায়।

উত্তর রাখাইনে ১৯৯১-৯২ সালে রোহিঙ্গাদের উপর 'অপারেশন ক্লিন এন্ড বিউটিফুল নেশন' নামক আরেকটি অভিযান চলে। এই অভিযানে ২.৫ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে শরণার্থী হয়। এরপর ২০১২ সালে ও ২০১৬ সালে যথাক্রমে ১ লাখ ও ৮৭ হাজার রোহিঙ্গা বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে চলে আসে। ২০১২ সালে রাখাইনের বৌদ্ধদের দ্বারা সৃষ্ট বৌদ্ধ-হিন্দু দাঙ্গায় ১৬৮ জন মুসলিম মারা যান, অপরদিকে ২০১৬ সালে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীই সরাসরি অভিযান চালায় রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে।

রোহিঙ্গা সমস্যা ও বাংলাদেশ

২৪ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে মিয়ানমারের সীমান্ত চৌকিতে কথিত সন্ত্রাসী হামলায় ৮৯ জন পুলিশ নিহত হয়। হামলার জন্য রোহিঙ্গাদের সংগঠন 'আরসা'কে দায়ী করে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী। এরপরই ২৫ আগস্ট, ২০১৭ হতে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী Ethnic Cleansing অভিযান চালায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। ২৫ আগস্টের সকাল থেকেই রাখাইন রাজ্যের গ্রামগুলো জ্বলতে শুরু করেছিল। এটি ছিল পূর্ব পরিকল্পিত রোহিঙ্গা উৎখাতকল্পে গণহত্যার সূত্রপাত। অতিদ্রুত ৪১৭টি গ্রামের ৯০ ভাগের বেশি পুড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে হত্যা, ধর্ষণ এবং লুটপাটের মতো গর্হিত কাজ সম্পন্ন করেছে।

বিবিসির এক হিসেবে দেখা যায়, সেনাবাহিনী শুধু সেপ্টেম্বর মাসেই ৭০০০ জনের বেশি শিশুকে হত্যা করে। Human Rights Watch (HRW) স্যাটেলাইট ইমেইজ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে যে, রাখাইনে ২৮৮টি গ্রাম আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ২৫ আগস্ট, ২০১৭ থেকে ২০১৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত জাতিসংঘের হিসেবে ১১,৫০,০০০ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আসে। চীনের উদ্যোগে ২ বার রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের চেষ্টা করা হলে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ২৫ আগস্ট, ২০১৯ সালে ৫ দফা দাবির ভিত্তিতে ফিরে যাবার শর্ত দেয়।

রোহিঙ্গা সমস্যা ও বাংলাদেশ

বর্তমান পরিস্থিতি

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মাঝে 'Arrangement on returns of the displaced people of Rakhaine State' শিরোনামে প্রত্যাবাসন চুক্তি স্বাক্ষর হয় ২৩ নভেম্বর, ২০১৭ সালে। চুক্তির ৬ বছর অতিক্রান্ত হলেও রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন করা সম্ভব হয়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৪ থেকে ৭৭তম অধিবেশনে মোট ৪ বার রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন কথাটি উত্থাপন করলেও তেমন বৈশ্বিক সাড়া পাওয়া যায়নি। এদিকে ২০২১ সাল থেকে মিয়ানমারে শুরু হয়েছে সেনা শাসনের নতুন অধ্যায়। এই পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন অনেকটা অনিশ্চিত পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মতো ছোট দেশের পক্ষে ১১.৫০ লক্ষ রোহিঙ্গাদের বহন করা এখন গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রোহিঙ্গা সমস্যা ও বাংলাদেশ

রোহিঙ্গা সমস্যার প্রভাব

বাংলাদেশ একটি ছোট ও ঘনবসতির দেশ। ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. আয়তনের বাংলাদেশে বর্তমান জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাজার ৯১১ জন। নিজ দেশের অধিক জনসংখ্যা নিয়ে বাংলাদেশ এমনিতে ব্যাপক চিন্তিত। রোহিঙ্গা সমস্যা মানবিক হলেও দুটি কারণে বাংলাদেশের পক্ষে রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ বাংলাদেশে আগে থেকেই অন্তত ৪ লাখ রোহিঙ্গা অবস্থান করছে। ঘনবসতির এই দেশে তারা ইতোমধ্যে ব্যাপক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন- অবৈধভাবে অবস্থান করে আইন শৃঙ্খলার জন্যও তারা বিড়ম্বনা সৃষ্টি করছে। একটি ক্ষুদ্র অংশ চরম পন্থা ও জঙ্গিবাদের সঙ্গে জড়িত যা নিরাপত্তার জন্য সমস্যা সৃষ্টি করছে। বিভিন্ন রোহিঙ্গা মাদক ব্যবসায়ী, তারা অবৈধভাবে বাংলাদেশের পাসপোর্ট ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে এতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে।

রোহিঙ্গা সমস্যা ও বাংলাদেশ

তাছাড়া মিয়ানমার তাদের লাখ লাখ রোহিঙ্গাদের পূর্বে যারা বাংলাদেশে অবস্থান করেছে তাদের নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ফলে বাংলাদেশে যেসব সমস্যা বা সংকট সৃষ্টি হয়েছে তা নিচে পয়েন্ট আকারে তুলে ধরা হলো:

• অর্থনৈতিক চাপ	• বনভূমি ধ্বংস
• নিরাপত্তা ঝুঁকি	• পর্যটন শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত
• পরিবেশ সংক্রান্ত ঝুঁকি	• স্বাস্থ্য ঝুঁকি
• প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা	• অপরাধ প্রবণতা
• জনসংখ্যা সমস্যা	• বিভিন্ন মহামারি ছড়ানোর হটস্পট

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা এ সংকটের দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের পথ খুলে দিতে পারে।

রোহিঙ্গা সমস্যা ও বাংলাদেশ

সম্ভাব্য সমাধান ও সুপারিশসমূহ

প্রধানমন্ত্রীর ৩টি প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা : ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ সালে রোহিঙ্গা সংকট চিরতরে সমাধানের জন্য নিউইয়র্কে "শরণার্থী বিষয়ক বৈশ্বিক প্রভাবের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক" এ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিন দফা সুপারিশ করেন।

- ✓ মিয়ানমারকে রোহিঙ্গাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আইন ও নীতি বাতিল করতে হবে।
- ✓ মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের নাগরিক সুবিধা ও অধিকার নিশ্চিত করে একটি সহায়ক পরিবেশ বা প্রয়োজনে সেফ জোন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- ✓ জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশনের সুপারিশের আলোকে ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদেরকে নৃশংসতার হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

রোহিঙ্গা সমস্যা ও বাংলাদেশ

রোহিঙ্গাদের পাঁচটি দাবির বাস্তবায়ন

যেহেতু রোহিঙ্গারা বারবার মিয়ানমারের জান্তা সরকারের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছে, তাই এ সমস্যা সমাধানে তাদের দাবিসমূহ বিবেচনায় রাখতে হবে। রোহিঙ্গাদের দাবিসমূহ –

- **নাগরিকত্ব:** আরাকানরাজ্যে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের 'সিটিজেন কার্ড' দিতে হবে।
- **প্রত্যাবাসন:** নিজের গ্রামে ফিরিয়ে নেওয়া ও জমিজমা ক্ষতিপূরণসহ ফেরত দিতে হবে।
- **নিরাপত্তা:** জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়ন করতে হবে।
- **জবাবদিহিতা:** আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে অপরাধীদের বিচার করতে হবে।
- **ন্যাটিভ স্ট্যাটাস:** ন্যাটিভ স্ট্যাটাস বা স্থানীয় মর্যাদা সংসদে আইন করে পুনর্বহাল করতে হবে।

রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় আরও যেসব পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে -

- ✓ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করে দ্রুত ফিরিয়ে নিতে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সকল সংস্থা ও পশ্চিমা বিশ্বকে এই উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত করা বিশেষ করে মিয়ানমারের ঘনিষ্ঠ রাষ্ট্র ভারত, চীন এবং রাশিয়াকে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে জড়িত করা।
- ✓ রাখাইনে রোহিঙ্গা নিধনযজ্ঞে জড়িত মিয়ানমারের নিপীড়নকারী ও দায়ী সেনা কর্মকর্তা ও মগদেরকে চিহ্নিত করে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করানো।

রোহিঙ্গা সমস্যা ও বাংলাদেশ

- ✓ গাম্বিয়ার দায়ের করা মামলায় আন্তর্জাতিক আদালতের অন্তর্বর্তী রায়ের নির্দেশনা প্রতিপালনে মিয়ানমারকে বাধ্য করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখা ও সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা।
- ✓ জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের নেতৃত্বে অনুসন্ধান কমিশনের সুপারিশমালার আলোকে রাখাইনের হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত সকলকে বিচারের আওতায় আনার জন্য জাতিসংঘকে সক্রিয় করতে বাংলাদেশের পক্ষ হতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।
- ✓ মিয়ানমারের নাগরিক সংশোধন আইন ১৯৮২ পরিবর্তন করে রোহিঙ্গাদের সাংবিধানিক নাগরিক অধিকার সংবিধানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে মিয়ানমারকে বাধ্য করতে আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগের জন্য বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখা।
- ✓ মিয়ানমার সরকারকে অবশ্যই রাখাইনে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সবধরনের নিরাপত্তা ও নিরাপদ চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি করতে কূটনৈতিক চাপ অব্যাহত রাখা।
- ✓ বৈষম্যমূলক সকল নীতি ও আইনকানুন তুলে নিয়ে রোহিঙ্গাদের শান্তিপূর্ণ বসবাসের নিরাপদ চলাচলের স্বাধীন ধর্ম ও কর্ম পালনের অধিকার নিশ্চিত করতে মিয়ানমারকে বাধ্য করা।
- ✓ মিয়ানমার সরকারকে অবশ্যই রাখাইন রাজ্যে অসহিষ্ণু ও নিপীড়ক বৌদ্ধ ধর্মীয় গুরু ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে নিবৃত্ত করতে এবং আইনের আওতায় আনতে মিয়ানমারকে চাপ প্রয়োগ করা। একইসাথে সহিংসতা বন্ধে বৌদ্ধধর্মের স্কলারদেরকে কাজে লাগাতে হবে যাতে করে ধর্মের নামে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ওপর সহিংসতা না চালায়।

রোহিঙ্গা সমস্যা ও বাংলাদেশ

- ✓ মিয়ানমারের কৌশলগত মিত্র ও প্রতিবেশী এবং বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাষ্ট্র ভারত, রাশিয়া ও চীনকে রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত ও সম্পৃক্ত করা।
- ✓ বাংলাদেশ সরকারকে অত্যন্ত দক্ষ ও সর্বোচ্চমাত্রার অন্তর্ভুক্তিমূলক কূটনৈতিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। প্রতিবেশী দেশসহ বিশ্ব শক্তিকে রোহিঙ্গা সংকটের বহুমুখী প্রভাব ও ফলাফল অনুধাবনের জন্য কার্যকর কূটনৈতিক পন্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে করে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে মিয়ানমার বাধ্য হয়।
- ✓ মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত শরণার্থীকে তাদের আবাসভূমিতে ফিরিয়ে নিতে সকল অঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ও শক্তিকে সম্মিলিতভাবে মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে সক্রিয় করা।
- ✓ রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বাংলাদেশে সকল রাজনৈতিক দল, মত, গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে সম্মিলিত ঐক্য ও জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা এবং সংঘবদ্ধ হয়ে মিয়ানমারের ওপর দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চাপ সৃষ্টি করা।
- ✓ রোহিঙ্গা সংকট একটি জটিল ও বহুমাত্রিক সমস্যা। এই সমস্যার কার্যকর সমাধানের জন্য কূটনীতিক, নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ, রাজনৈতিক প্রতিনিধি, একাডেমিক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল পেশাজীবী ও কৌশলবিদসহ সংশ্লিষ্টজনদেরকে নিয়ে একটি রোহিঙ্গা টাস্কফোর্স গঠন করা যাতে করে ওই টাস্কফোর্স ভূরাজনৈতিক, আঞ্চলিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয় বিবেচনায় নিয়ে রোহিঙ্গা সংকটের একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করতে পারে।

রোহিঙ্গা সমস্যা ও বাংলাদেশ

- ✓ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের যে প্রস্তাব দিয়েছে তার যে-কোনো একটিকে ভিত্তি ধরে সংকট সমাধানের জন্য কার্যকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং আগ্রাসী কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করা।
- ✓ নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবাসনের পূর্বে মিয়ানমার সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের প্রতি রোহিঙ্গা শরণার্থীর আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন অপরিহার্য, সেজন্য রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রতিনিধিসহ জাতিসংঘের নেতৃত্বে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদল মিয়ানমারের রাখাইন অঞ্চল পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা এবং প্রতিনিধিদলের সন্তোষজনক রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রত্যাবাসন শুরু করা।

পরিশেষে বলা যায়, রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা একটি আন্তর্জাতিক ইস্যু। বেঁচে থাকা ও নিজ ভূমিতে অবস্থান সব মানুষের জন্মগত অধিকার। এই অধিকার থেকে বঞ্চিত রোহিঙ্গাদের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার করুণ আর্তি ও অতীত ইতিহাস বিশ্ব বিবেকের সামনে তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন।এছাড়াও আন্তর্জাতিক মহলে রোহিঙ্গা সমস্যার প্রকৃত তথ্য উন্মোচন ও সুদক্ষ কূটনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে এ সমস্যার আশু কার্যকর সমাধান করা জরুরি।

জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সুপারিশসমূহ

ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তনকে বর্তমানে সারা বিশ্বেই এক বিশাল চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। আধুনিক সভ্যতার বিপুল অগ্রগতির ফলে মানুষের জীবন যাপনের মান উন্নত হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই সাথে অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে বাড়ছে বিভিন্ন দূষণ ও বৈশ্বিক উষ্ণতা। মানব সৃষ্ট ও প্রাকৃতিক নানা কারণে জলবায়ুর যে পরিবর্তন হচ্ছে তাতে নানান বিরূপ প্রভাব দেখা যাচ্ছে যা সামনে আরো প্রকট হবে। আর দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, জলবায়ু পরিবর্তনে কোনো দায় না থাকা বাংলাদেশই হতে যাচ্ছে সবচেয়ে বড় ক্ষতির শিকার। তাই এই বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যেগুলোর সফলতার উপর নির্ভর করছে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ।

জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা

পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ হলো বাংলাদেশ যার দক্ষিণ পাশে রয়েছে সুবিশাল বঙ্গোপসাগর। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। IPCC এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, সমুদ্রের পানির উচ্চতা এভাবে বাড়তে থাকলে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের উপকূলের ৩০% এলাকা সমুদ্রে তলিয়ে যাবে এবং জলবায়ু উদ্বাস্তুদের পরিমাণ হবে উপকূলের এক-তৃতীয়াংশ। অন্যদিকে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেখা দিচ্ছে খরা, যার কারণে উত্তরাঞ্চলে ফসল উৎপাদন কমে যাচ্ছে। বিশ্ব জলবায়ু প্রতিবেদনে শীর্ষ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে বাংলাদেশের অবস্থান ৭ম। আর ক্ষয়ক্ষতির হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান ৫ম।

জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সুপারিশসমূহ

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ

পৃথিবীর পরিবেশ ও জলবায়ু হঠাৎ করেই একদিনে কিংবা দুই এক বছরে মানুষের বসবাসের জন্য হুমকি হয়ে উঠেনি; বরং দীর্ঘকাল ধরে মানুষ পরিবেশকে তার প্রয়োজনে ব্যবহার করতে গিয়ে বিপর্যস্ত করে তুলেছে, ঘটিয়েছে পরিবেশ দূষণ, যার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন। পৃথিবীব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনে বিজ্ঞানীরা দুটি কারণকে চিহ্নিত করেছেন। যথা- প্রাকৃতিক কারণ এবং মানবসৃষ্ট কারণ।

প্রাকৃতিক কারণ: প্রাকৃতিক কারণে জলবায়ুর যে পরিবর্তন হয় সেগুলোতে মানুষের কোনো হাত থাকে না, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই দীর্ঘসময় ধরে এই পরিবর্তনগুলো হয়। এ ধরনের পরিবর্তনের ফলে প্রভাবও খুব একটা চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মতো আকস্মিক প্রাকৃতিক ঘটনায় কিংবা দাবানলের ফলে জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাকৃতিক কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে –

• পৃথিবীর অক্ষরেখার পরিবর্তন	• মহাসাগরীয় পরিবর্তন
• সূর্যরশ্মির পরিবর্তন	• আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি

জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সুপারিশসমূহ

মানবসৃষ্ট কারণ: বিজ্ঞানীরা জলবায়ুর সাম্প্রতিক দৃশ্যমান পরিবর্তনের জন্য মানব কর্তৃক বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধিকারক গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ বৃদ্ধিকে নির্দেশ করেছেন। মূলত বর্তমানকালে জলবায়ু পরিবর্তন বলতে সারা পৃথিবীর মানবজাতির কর্মকাণ্ডের কারণে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনকে বোঝায়। এসব কাজকর্মের মধ্যে রয়েছে:

• জনসংখ্যা বিস্ফোরণ	• পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার ও যুদ্ধ
• বৃক্ষ নিধন	• প্লাস্টিক ও অন্যান্য অপচনশীল দ্রব্যের ব্যাপক ব্যবহার
• রাসায়নিক পদার্থের অপব্যবহার	• জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি
• অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়ন	• অপরিকল্পিত উন্নয়ন ইত্যাদি
• বিলাসজাত দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি	

জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সুপারিশসমূহ

বাংলাদেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব বাংলাদেশে বিগত কয়েক দশকে বেশ ভালোভাবেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখানে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের সামনে যে সকল চ্যালেঞ্জ হাজির হয়েছে সেসব নিয়ে আলোচনা করা হলো।

- **সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি:** IPCC এর তৃতীয় সমীক্ষার প্রতিবেদন অনুযায়ী সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা ৪৫ সেন্টিমিটার বাড়লে বাংলাদেশের ১১ শতাংশ ভূখণ্ড সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে যাবে। এ প্রতিবেদন অনুসারে ২১০০ সালের মধ্যে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ১.৮ সেন্টিমিটার হতে ৫৯ সেন্টিমিটারে উন্নীত হবে।
- **উদ্বাস্তু সমস্যা:** WHO এর মতে, ২০২২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ৭.১ মিলিয়ন মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্তুর শিকার হয়েছে। ২০৫০ সালের মধ্যে এ সংখ্যা ১৩.৩ মিলিয়নে পৌঁছাবে। সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের এক রিপোর্টে দেখানো হয়েছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় প্রতিবছর প্রায় ৪ লাখ জলবায়ু উদ্বাস্তু ভীড় জমাচ্ছে। ভবিষ্যতে এ সংখ্যা আরও দ্রুত বৃদ্ধি পাবে বলেই রিপোর্টে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।
- **প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি:** জলবায়ু পরিবর্তনের আরেকটি ফল হলো বাংলাদেশে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা ও মাত্রা বেড়ে যাওয়া। সেগুলো হলো: ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ভূমিধস, ভূমিকম্প, বজ্রপাত ইত্যাদি। Providing Regional Climates for Impact Studies (PRECIS) এর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৯৬১-১৯৯০ সময়ের তুলনায় ২০৩০, ২০৫০ এবং ২০৭০ সালে যথাক্রমে প্রায় ৪ শতাংশ ২.৩ শতাংশ এবং ৬.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, প্রতি ৩-৫ বছরে বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চল বন্যা প্লাবিত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সুপারিশসমূহ

- **প্রাকৃতিক সম্পদ হ্রাস:** জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে নানারকম প্রাকৃতিক সম্পদ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে বাংলাদেশে। অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতিই হারিয়ে যেতে বসেছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। ২০১০ সালে বিশ্বব্যাংক প্রণীত 'Economics of Adaptation to Climate Change: Bangladesh' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, শুধুমাত্র ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা মোকাবিলায় ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে বিনিয়োগ এবং আবর্তক ব্যয় বাবদ যথাক্রমে ৫,৫১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে।

- **সুপেয় পানির অভাব:** IPCC পানিসম্পদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে তৈরি একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশসহ সমুদ্রতীরের বেশ কটি দেশে ভবিষ্যতে মিঠা পানির তীব্র সংকট দেখা দেবে। ইতোমধ্যে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস পাওয়ায় অনেক এলাকায় দেখা দিচ্ছে সুপেয় পানির অভাব।

- **লবণাক্ততা বৃদ্ধি:** যখন সমুদ্রের উচ্চতা বাড়ে তখন লোনা পানি নদী এবং ওপরের স্রোতের ভেতর ছড়িয়ে পড়ে, এক সময় যা মাটিতে মিশে যায়। এই লোনা পানির আগ্রাসনে উপকূলীয় এলাকায় দেখা দিচ্ছে উর্বর কৃষি জমির সংকট।

জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সুপারিশসমূহ

- **স্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধি:** জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে নানারকম স্বাস্থ্যঝুঁকিতে রয়েছে বাংলাদেশের মানুষ। বিশ্বখ্যাত স্বাস্থ্য সাময়িকী The Lancet এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সংক্রমণ ও কীটপতঙ্গবাহিত রোগের ধরনে পরিবর্তন আসবে, তাপপ্রবাহে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়বে, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখি ইত্যাদিতে সরাসরি মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়বে।

- **কৃষিক্ষেত্রে ক্ষতি:** অনিয়মিত, অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত; সেচের পানির অপর্যাপ্ততা; উপকূলীয় অঞ্চলে বর্ষা মৌসুম ছাড়াও বিভিন্ন সময় উপকূলীয় বন্যা ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধিতে লবণাক্ত পানিতে জমি ডুবে যাওয়া এবং শুষ্ক মৌসুমে মাটির নিচের লবণাক্ত পানি উপরের দিকে বা পাশের দিকে প্রবাহিত হওয়ার মতো নানাবিধ সমস্যায় বাংলাদেশের কৃষির ভবিষ্যৎ চরম হুমকির মুখে।

- **অর্থনৈতিক ক্ষতি:** জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের কৃষি ও মৎস্যখাত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশের জিডিপিতে। প্রতিবছর জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান কমে যাচ্ছে। এছাড়াও দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের অবকাঠামো খাতে খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সুপারিশসমূহ

জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যার সমাধানে সুপারিশসমূহ

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় শীর্ষে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা সমাধানে করণীয় বা সুপারিশসমূহ:

- ✓ UNFCCC এর উদ্যোগে গঠিত ১০০ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে যে Green Climate Fund গঠিত হয়েছে তাতে বাংলাদেশের যা প্রাপ্য তা আদায় করার জন্য সর্বোচ্চ কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে।
- ✓ জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ যেসকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হচ্ছে সেগুলোর কয়েকটি থেকে রক্ষাকবচ হিসেবে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন ভূমিকা রাখছে। গবেষণায় দেখা গেছে ম্যানগ্রোভ বন সংরক্ষণে ৩০ বছরে ১০ হাজার ৫০০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ আন্তর্জাতিক দাতা গোষ্ঠীদের থেকে আদায় করার জন্য যে যে চ্যানেলে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালানো সম্ভব তা করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা যেতে পারে।
- ✓ বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের পাশাপাশি বাংলাদেশেও পরিবেশ দূষণ রোধ করার জন্য প্রয়োজন জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ধীরে ধীরে নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে যাতে ফিরে আসে সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সুপারিশসমূহ

- ✓ জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সভা সেমিনারের আয়োজন এবং জলবায়ু সম্পর্কিত জাতিসংঘের অধীনে আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশে আরো কী কী করণীয় তা নির্ধারণ করা যেতে পারে। UNFCCC, COP প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান যেন বাংলাদেশের জন্য কাজ করে সে ব্যাপারে কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
- ✓ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের যে সকল খাত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে (কৃষিক্ষেত্র, সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা, বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি) সেগুলো মোকাবিলার জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলোকে অনুসরণ করা যেতে পারে।
- ✓ বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ অতিরিক্ত জনসংখ্যা ও দরিদ্রতা। বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং দরিদ্রতা মোকাবিলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখা যেতে পারে।
- ✓ জলবায়ু পরিবর্তন তথা বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে যে বিশাল সংখ্যক মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হতে যাচ্ছে তাদের পুনর্বাসনের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতাগোষ্ঠীদের সহযোগিতা আদায়ে জোর কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সুপারিশসমূহ

- ✓ মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে আসা প্রায় ১১.৫ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের চাপে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই শরাণার্থীদের তাদের নিজ বাসভূমিতে ফেরত পাঠানোর জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা যেতে পারে।
- ✓ আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতার ছবি, ভিডিও বা ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা।
- ✓ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের পরিসংখ্যানগত তথ্য-উপাত্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উপস্থাপন ও দুর্যোগ প্রশমন কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে।
- ✓ আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে কোন দেশ কী পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ করতে পারবে তার আইনি বাধ্যবাধকতা মেনে চলার সুপারিশ করা যেতে পারে।
- ✓ আন্তর্জাতিক ক্লাইমেট চেঞ্জ নেগোশিয়েশন এ ৪৮টি স্বল্পোন্নত দেশের গ্রুপ এলডিসিতে বাংলাদেশের নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকাকে কাজে লাগানো যেতে পারে।
- ✓ পরিবেশ ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের মতামত সম্বলিত কেস স্টাডি এবং তাদের প্রদত্ত অভিযোজন কৌশল বিভিন্ন উন্নত দেশে উপস্থাপন ও তাদের সহানুভূতি আদায়ে প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে।

সর্বোপরি বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এ ঝুঁকি মোকাবিলা করার জন্য সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এটি কেবল বাংলাদেশের সমস্যা নয় বরং বিশ্বময় সমস্যা। পৃথিবী নামক আমাদের এ গ্রহের জলবায়ু সমস্যা মোকাবিলায় বিশ্বনেতাদের এক মঞ্চে ঐক্যমতে আনা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।অন্যথায় এই পৃথিবী বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে ।

❖ সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy)

সুনীল অর্থনীতি

❖ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সুনীল অর্থনীতির গুরুত্ব ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশ ১ লাখ ১৮ হাজার বর্গকিলোমিটার সমুদ্রের মালিক। আর এই নীল জলরাশির মাঝে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বিচিত্র সামুদ্রিক সম্পদ। তেল, গ্যাস, মূল্যবান বালু, ইউরেনিয়াম, মোনাজাইট, জিরকন, শামুক, ঝিনুক, মাছ, অক্টোপাস, হাঙ্গর ইত্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক প্রাণিজ ও খনিজসম্পদ রয়েছে সাগরে। বঙ্গোপসাগর হচ্ছে মৎস্য সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার। এখানে প্রায় ৫০০ প্রজাতির মাছ রয়েছে। আরও রয়েছে ২০ প্রজাতির কাঁকড়া, ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি, ৩০০ প্রজাতির শামুক-ঝিনুক। এছাড়াও রয়েছে টুনা মাছের মতো দামি ও সুস্বাদু মাছ, যার রয়েছে প্রচুর আন্তর্জাতিক চাহিদা। 'সেভ আওয়ার সি'-এর তথ্যমতে, সমুদ্র থেকে শুধু মাছ রফতানি করে বিলিয়ন বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করা সম্ভব।

➲ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-এর মতে, ২০২২ সালের মধ্যে যে চারটি দেশ মৎস্য সম্পদে বিপুল পরিমাণ সাফল্য অর্জন করবে, তার মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম। ২০১৭-২০ সালে সারা দেশে মোট উৎপাদিত মাছের মধ্যে সামুদ্রিক মাছ ছিল ৬০ লাখ মেট্রিক টন; যদিও ৮০ লাখ টন মাছ ধরার সুযোগ রয়েছে। ৬০০ কিলোমিটার সমুদ্রসীমার মধ্যে মাছ ধরার সীমানা মাত্র ৩৭০ কিলোমিটার। কিন্তু দক্ষ জনশক্তি ও প্রযুক্তির অভাবে এ দেশের জেলেরা মাত্র ৭০ কিলোমিটার পর্যন্ত মাছ ধরতে পারে। ফলে বিপুল পরিমাণ মৎস্য সম্পদ থাকার পরও কাজে লাগানো যাচ্ছে না। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে যথাযথ পদক্ষেপ নিয়ে বিপুল পরিমাণ সম্পদ কাজে লাগাতে হবে।

➲ সমুদ্রকে ঘিরে বাংলাদেশ বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারে। যা দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, জ্বালানি নিরাপত্তা, শিল্প উন্নয়ন, টেকসই ও পর্যাপ্ত জীবিকা অর্জন, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সুনীল অর্থনীতি

সমুদ্র অর্থনীতিতে (ব্লু ইকোনমি) বিনিয়োগের নতুন দিগন্তে বাংলাদেশ। ২০২১ সালে সমুদ্র অর্থনীতিকে আরও সমৃদ্ধ করতে চায় সরকার। এই লক্ষ্য পূরণে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের পরামর্শ দিচ্ছেন বিশ্লেষণকরা। তাদের ভাষ্য, বাংলাদেশের জলসীমায় সাগরের নিচে নতুন অর্থনীতি। সাগরের তলদেশ ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারলে ২০৩০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ৫ শতাংশ অর্জিত হবে সমুদ্র অর্থনীতি থেকে।

গভীর সমুদ্রের বিশাল অংশ বাংলাদেশের জলসীমায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর পরিমাণ দেশের স্থলভাগের প্রায় ৮১ শতাংশ। এখানে রয়েছে ছোট বড় মিলিয়ে ৭৫টির মতো দ্বীপ। এগুলোকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ প্রয়োজন।

বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ সীমানার অন্তত ১৩টি স্থানে রয়েছে সোনার চেয়েও মূল্যবান বালু, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম। যাতে মিশে আছে ইলমেনাইট, গার্নেট, সিলিমেনাইট, জিরকন, রুটাইল ও ম্যাগনেটাই। অগভীরে জমে আছে 'ক্লে' যা দিয়ে তৈরি হয় সিমেন্ট। হিমালয়কেও হার মানাবে। এই ক্লে উত্তোলন সম্ভব হলে বাংলাদেশের সিমেন্ট পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান সরকারের গত মেয়াদে 'সমুদ্র বিজয়' এই সম্ভাবনাকে আরও প্রসারিত করেছে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, বিশ্বের ৩৫ কোটি মানুষের জীবিকা সরাসরি সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদনের শতকরা ২০ ভাগ জোগান আসে সমুদ্র থেকে বিশ্বের মোট মৎস্য উৎপাদনের ১৬ ভাগের অবদান বঙ্গোপসাগরের।

সুনীল অর্থনীতি

অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, কেবল সমুদ্র অর্থনীতির সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে যথেষ্ট আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব। সমুদ্র ব্যবহার করে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে বাংলাদেশের রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা।

মৎস মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বঙ্গোপসাগরের তলদেশে তেল, গ্যাস বা খনিজসম্পদই শুধু নয়, বাংলাদেশ গভীর সমুদ্রের ন্যায্য অধিকার পাওয়ায় মৎস্য আহরণের বিপুল সম্ভাবনাও দামী এই মাছ বাংলাদেমের আন্তর্জাতিক মানের হোটেলগুলোতে আমদানি করা হয়ে থাকে। টুনা মাছের বিচরণ গভীর সমুদ্রে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন সমুদ্রবন্দর কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সমুদ্রনির্ভর। বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানির ৯০ শতাংশই সম্পাদিত হয় সমুদ্রপথে।

পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, 'আগামীতে বাংলাদেশ হবে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। আর এটি করতে হলে শুধু সমুদ্র নয়, যেখানেই সম্ভানা রয়েছে সেখানেই বিনিয়োগ বা উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে'।

ভূ-রাজনীতিতে বঙ্গোপসাগর

এ অঞ্চলের ভূ-রাজনীতিতে এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে নিয়েছে সমুদ্র। কৌশলগত গুরুত্বের কারণে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরাশক্তিগুলোর মনোযোগের মধ্যে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নিয়ে হাজির বাংলাদেশের জন্য দরকারী গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের মাধ্যমে হোক বা নানা সহযোগিতার আবরণেই হোক, সবাই চায় এ অঞ্চলে নিজেদের অবস্থান জোরালো করতে।

১. নিয়ন্ত্রণ করা: ১৯ শতকের মার্কিন নৌ-কৌশলবিদ আলফ্রেড থায়ার মাহান সমুদ্রবাণিজ্য, নৌপথ, নৌশক্তি, এর নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ এসব নিয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন। সেই প্রবন্ধগুলোর সংকলন নিয়ে প্রকাশিত বইটির নাম দ্য ইন্টারেস্ট অব আমেরিকা হন। সি পাওয়ার (১৮৯৭)। সেখানে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, সমুদ্রবাণিজ্য বা নৌশক্তি যেভাবেই হোক, সমুদ্র যার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, তার পক্ষে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তার যুক্তি হচ্ছে, স্থলভূমিতে যতই সম্পদ থাকুক না কেন, সমুদ্রপথে সম্পদ বিনিময় বা বাণিজ্য যত সহজ, অন্য কোনো পথে অত সহজ নয়। আজকের দুনিয়ার বিশ্ববাণিজ্যের ৯০ ভাগই হয় সমুদ্রপথে। সমুদ্র যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর কার্যত একক নিয়ন্ত্রণ থাকার কারণেই যুক্তরাষ্ট্র সারা দুনিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং ছড়ি ঘুরিয়ে যেতে পারছে। এশিয়ার ভূ-রাজনীতি ও অর্থনীতিবিষয়ক বিশ্লেষক রিচার্ড জাভেদ হেইডেরিয়ান আল-জাজিরায় এক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'নতুন এক নৌশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক সমুদ্রব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে উল্টে দিচ্ছে। চীন তার মহাদেশীয় প্রতিবেশীদের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী, তার নৌশক্তিও ক্রমেই বাড়ছে।

ভূ-রাজনীতিতে বঙ্গোপসাগর

২. কৌশল অবলম্বন: এটা পরিষ্কার যে বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার যেমন সম্ভাবনা রয়েছে বিরোধের আশঙ্কাও। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রাজনীতির আধিপত্য বিস্তার ও বাণিজ্য স্বার্থের এই জটিল হিসাব-নিকাশে বাংলাদেশের কৌশলী অবস্থানের কোনো বিকল্প নেই।

৩. বৈশ্বিক মনোযোগ: বাংলাদেশের সমুদ্র অঞ্চল ও সমুদ্র সীমানা সঙ্গত কারণেই এখন বৈশ্বিক মনোযোগের মধ্যে রয়েছে। বাংলাদেশে নৌবাহিনীর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা তুলে ধরতে গিয়ে আলফ্রেড থায়ার মাহান লিখেছেন বর্তমানে বাংলাদেশ নৌবাহিনী বিএনএস সমুদ্র জয় ও বিএসএন সমুদ্র অভিযান নামে যে দুটি সামরিক নৌযান পরিচালনা করছে, তা একসময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোস্টগার্ড পরিচালনা করত।

বৈশ্বিক সামদ্রিক বাণিজ্যের ৩০ শতাংশ ও বার্ষিক প্রায় ৫ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলারের সরবরাহ করে ভারত মহাসাগর থেকে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বাণিজ্য পথ ধরে।

বঙ্গোপসাগর ও বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক সম্পর্ক

বাংলাদেশের দক্ষিণে ২১ লক্ষ ৭৩ হাজার বর্গ কি.মি. আয়তনের বৃহৎ জলরাশি বঙ্গোপসাগরের অবস্থান বিশ্বরাজনীতিতে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-কৌশলগত গুরুত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

১. কৌশলগত সম্পর্ক: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একপাশে আটলান্টিক ও অন্যপাশে প্রশান্ত মহাসাগরের মত বিশাল জলরাশির অবস্থান ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় এবং দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কৌশলগত সমুদ্রপথ, গুরুত্বপূর্ণ চেকপয়েন্ট ও প্রণালী, ব্যাপক হাইড্রোকার্বন তথা সমুদ্রপথ, গুরুত্বপূর্ণ চেকপয়েন্ট ও প্রণালী, ব্যাপক হাইড্রোকার্বন তথা সমুদ্রসম্পদের উপস্থিতি ও কৌশলগত নানাবিধ কারণে বৃহৎ শক্তি ও আঞ্চলিক শক্তিরাষ্ট্রসমূহের কাছে বঙ্গোপসাগর হলো অন্যতম কেন্দ্রস্থল।

২. অর্থনৈতিক সম্পর্ক: অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথা চিন্তা করলে দেখা যায় যে, বঙ্গোপসাগর শুধু জলের ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত এক বিশাল লবণাক্ত জলরাশি নয়, এখানে রয়েছে প্রাকৃতিক, খনিজ বঙ্গোপসাগরে খনিজ সম্পদের সঠিক আহরণ ও ব্যবহার বাংলাদেশকে আগামী দিনের এনার্জি সুপার পাওয়ারে পরিণত করবে।

বঙ্গোপসাগর ও বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক সম্পর্ক

৩. জীববৈচিত্রের আধার: বঙ্গোপসাগরে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম খাদ-সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড যেখানে তিমি, ডলফিন ও কচ্ছপসহ বিরল জলজ প্রাণীর নিরাপদ প্রজনন কেন্দ্র জীববৈচিত্র্যের অন্যতম আধার। এখানেও খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ আছে বলে ধারণা করা হয়। বিশাল এই জলভাণ্ডারে রয়েছে মৎস সম্পদের প্রচুরতা।

৪. সমুদ্র অর্থনীতির সম্পর্ক: ভূ-অর্থনৈতিক গুরুত্বের দিক থেকে বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের সমুদ্র অর্থনীতির এক বিরাট ভাণ্ডার। সমুদ্র থেকে অর্জিত আয়কে সমুদ্র অর্থনীতি বা ব্লু ইকোনমি বলা হয়ে থাকে। বঙ্গোপসাগরের মজুদ খনিজ সম্পদের কৌশলগত ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ শক্তি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। মৎস্য সম্পদ আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ বৈদেশিক রপ্তানি আয়ে অবদান রাখতে পারে।

৫. বিনিয়োগ বৃদ্ধি: বঙ্গোপসাগর ও বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক বাস্তবতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ তার পররাষ্ট্রনীতিকে দ্বিপাক্ষিকতা ও বহুপাক্ষিকতার সমন্বয় করতে পারে। দ্বিপাক্ষিকতার ক্ষেত্রে ভারত, জাপান, চীনসহ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করে বাণিজ্য বৈষম্য রোধ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে পারে।

৬. কৌশলগত সম্পর্ক: বঙ্গোপসাগরকে ঘিরে যে কৌশলগত প্রতিযোগিতা তৈরি হয়েছে সেখানে সরাসরি অংশগ্রহণ না করে দ্বি-পাক্ষিক ও বহু-পাক্ষিক কৌশলগত সম্পর্ক এর মাধ্যমে সমুদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। ফলে ভারত বেষ্টিত ও ভারত নির্ভর রাষ্ট্র নামে প্রথাগত ধারণার পরিবর্তন করে একটি ক্রমবর্ধমান উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তিশালী বাংলাদেশের উন্নয়নের দ্বার উন্মোচন করবে এই বিশাল লবণাক্ত জলরাশির বঙ্গোপসাগর।

বাংলাদেশি মানব সম্পদের শ্রমবাজার

ভূমিকা

বাংলাদেশের দক্ষ জনশক্তির চাহিদা রয়েছে বিশ্ব শ্রমবাজারে। সময় পরিক্রমায় নতুন নতুন দেশে এর সম্ভবনা সৃষ্টি হচ্ছে। পোল্যান্ড, সার্বিয়া, রোমানিয়া, আলবেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়ায় স্ব-উদ্যোগে ভিসা নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই লোক যাচ্ছে। এটা আমাদের নতুন শ্রমবাজার। তবে বিদেশের দূতাবাসগুলোতে জনবল ও অবকাঠামো সংকট থাকায় বাংলাদেশের শ্রমবাজার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। শ্রমবাজার বাড়াতে হলে এসব সুযোগও বাড়াতে হবে। শ্রমবাজারের চাহিদা মেটাতে তৈরি করতে হবে দক্ষ জনশক্তি।

বাংলাদেশি মানব সম্পদের শ্রমবাজার

বিশ্ব শ্রমবাজারে বাংলাদেশের অবস্থান

বর্তমানে প্রবাসী শ্রমিক প্রেরণ ও প্রবাসী আয়ে শীর্ষ দেশ ভারত। বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে ৭ম। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ ২য় অবস্থানে রয়েছে। সরকারি হিসাবমতে ১৯৭৬ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ বাংলাদেশির। বিগত কয়েক বছরের বাংলাদেশের শ্রম বাজারের চিত্র তুলে ধরা হলো –

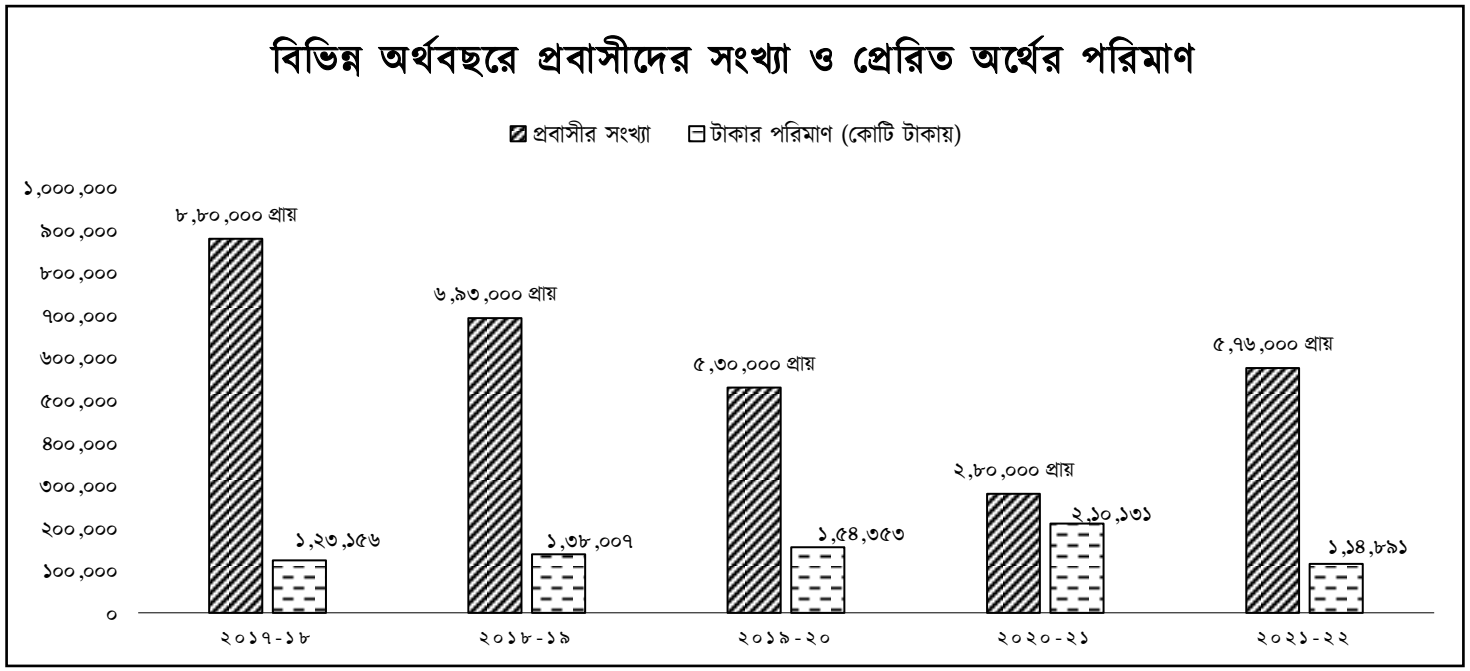

[তথ্যসূত্র : অর্থনৈতিক সমীক্ষা – ২০২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত]

বাংলাদেশি মানব সম্পদের শ্রমবাজার

পূর্ব ইউরোপে বাংলাদেশের শ্রমবাজার

জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, পোল্যান্ড, বেলারুশ, রোমানিয়া, জর্জিয়া, বুলগেরিয়া, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, সার্বিয়া পূর্ব ইউরোপের এই দেশগুলোতে প্রতিনিয়ত বাড়ছে বাংলাদেশি শ্রমিকের সংখ্যা। মধ্যপ্রাচ্য থেকে সুযোগ সুবিধা, কাজের পরিবেশ ও পারিশ্রমিক ভালো হওয়ায় এখন অনেকেই ইউরোপের দিকে ধাবিত হচ্ছে। UNDESA-4 এর তথ্যমতে, ২০২১ সাল পর্যন্ত ৪,৫৬,৫১৬ জন বাংলাদেশি ইউরোপে কর্মরত রয়েছে।

আগ্রহের শ্রমবাজারে পরিণত হয়েছে পূর্ব ইউরোপের দেশ রোমানিয়া। হঠাৎ করেই সেখানে বাংলাদেশিদের কাজের জন্য যাওয়ার সুযোগও তৈরি হয়েছে। রীতিমতো বাংলাদেশে বিশেষ কনস্যুলার অফিস বসিয়ে ভিসা ইস্যু করছে রোমানিয়া। ইউরোপের দেশ হওয়ায় বিশেষ আগ্রহ এই দেশটি নিয়ে। এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ৪০ হাজার কর্মী নেওয়ার ঘোষণা তৈরি করেছে বাড়তি আকর্ষণ।

বাংলাদেশি মানব সম্পদের শ্রমবাজার

চিত্র: পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহ

বাংলাদেশি মানব সম্পদের শ্রমবাজার

সমস্যাসমূহ: পূর্ব ইউরোপে বাংলাদেশি শ্রমিক রপ্তানির ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো দেখা দিচ্ছে –

- পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশের সাথে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত শ্রমিক প্রেরণের জন্য কোনো ধরনের রাষ্ট্রীয় চুক্তি স্বাক্ষর করেনি।
- আমাদের দেশ থেকে এখন পর্যন্ত শ্রমিক ভিসায় ইউরোপে বৈধভাবে শ্রমিক পাঠানোর সুযোগ তৈরি হয়নি। যারা যান তারা মূলত স্টাডি ভিসায় সেখানে গিয়ে কাজ করেন।
- ইউরোপের দেশগুলো উন্নত হওয়ায় তারা শিক্ষিত, দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবলের চাহিদা দেয় যা বাংলাদেশ এখনও তৈরি করতে পারেনি।
- রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিট এর তথ্যমতে ২০২১-২২ অর্থবছরে বিদেশে যাওয়া ৭৪ শতাংশ বাংলাদেশি শ্রমিকই ছিল অদক্ষ।
- শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ, মজুরি ও অন্যান্য কল্যাণে বাংলাদেশি দূতাবাসগুলো তেমন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না।

বাংলাদেশি মানব সম্পদের শ্রমবাজার

সম্ভাব্য সমাধান বা সুপারিশসমূহ

- পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষিত, দক্ষ ও যোগ্য কর্মী তৈরি করে রপ্তানি করতে হবে।
- পূর্ব ইউরোপের যে দেশগুলোতে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে সেই দেশগুলোর ভাষা শিক্ষার প্রতি জোর দিতে হবে ও সংশ্লিষ্ট ভাষায় প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- পূর্ব ইউরোপ তথা সারাবিশ্বে ইংরেজি ভাষার কদর রয়েছে। তাই সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে।
- শ্রমিকদের ১-২ মাস হাতে কলমে প্রশিক্ষণ না দিয়ে ৬-১২ মাসের ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ দিতে হবে যেন সংশ্লিষ্ট কাজে দক্ষ হয়ে উঠে।
- বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা যেমন: ওয়েল্ডিং, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী মেরামত, গাড়ি মেরামত, বৈদ্যুতিক কাজ ইত্যাদি কাজের শিক্ষা রাষ্ট্র থেকে সরবরাহ করতে পারে।

বাংলাদেশি মানব সম্পদের শ্রমবাজার

- পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর সাথে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদার করতে পারে।
- দূতাবাস বা মিশনগুলোকে নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টির জন্য গ্রাহক দেশে তৎপরতা বাড়ানো যেতে পারে।
- নিরাপদ অভিবাসনের জন্য জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, বৈধ পথে ইউরোপের দেশ গ্রিস, মাল্টা, আলবেনিয়া, সার্বিয়া, যুগোস্লাভিয়া, ক্রোয়েশিয়া, রোমানিয়া ও মাল্টায় কর্মী পাঠাতে চায় সরকার। এ নিয়ে ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে দ্রুত সময়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া চলছে। আশা করা হচ্ছে, দেশগুলোর সঙ্গে চূড়ান্ত চুক্তি সম্পন্ন হলে বিপুলসংখ্যক কর্মীর কর্মসংস্থান হবে।

বাংলাদেশি মানব সম্পদের শ্রমবাজার

- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নত বীজ, উন্নত সেচ যন্ত্র, সার ও কীটনাশকের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- প্রবাসী আয়ের প্রবাহ ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন দেশের সাথে কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি ও বৈধ অভিবাসন নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা যেতে পারে।
- মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে ধরতে হবে আর এজন্য মুদ্রানীতি সংস্কার ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।
- সরকারের রাজস্ব আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য কর ও শুল্ক হার উন্নত ও অটোমেশন পদ্ধতির আওতায় নিয়ে আসা যেতে পারে।
- অবৈধভাবে যেন রেমিট্যান্স পাঠাতে না পারে তার জন্য ব্যাংকিং সেবা ও কিছু বিশেষ সুবিধা গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে।
- সামাজিক নিরাপত্তা খাতে অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করা ও অর্থ পাচার প্রতিরোধ করা।
- উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলোতে অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে আনা যেতে পারে।

বাংলাদেশি মানব সম্পদের শ্রমবাজার

সমস্যা সমাধানের সুপারিশ

ভয়াবহ এ অর্থনৈতিক মন্দা থেকে উত্তরণের জন্য জাতীয় উদ্যোগের পাশাপাশি বৈশ্বিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও নীতি নির্ধারণ গ্রহণ করার মাধ্যমে এ মন্দা মোকাবিলা করা সম্ভব হবে বলে অর্থনীতি বিশ্লেষকরা মনে করেন। মন্দা মোকাবিলার জন্য যেসব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে--

- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্য আমদানি ও উৎপাদন স্বাভাবিক রাখা যেতে পারে। অধিকন্তু কৃষি উৎপাদনের উপর আরো জোর দিতে হবে।
- শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি ও রপ্তানিতে বৈচিত্র্য আনা যেতে পারে।
- অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে বেকারত্ব হ্রাস করে অধিক কর্মসংস্থানের দিকে নজর দিতে হবে।
- জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য জীবাশ্ম জ্বালানির পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। যেমন: বায়ু বিদ্যুৎ, জল বিদ্যুৎ, বায়ু গ্যাস ইত্যাদি।

বৈশ্বিক মহামন্দা

ভূমিকা

করোনা মহামারি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে বিরাজ করছে অস্থিরতা। বিশ্বের অনেক উন্নত দেশ যেমন: যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, কানাডাসহ অনেক দেশে চরম মাত্রায় বেড়েছে মূল্যস্ফীতি। জ্বালানির দাম বেড়েছে প্রায় ২-৩ গুণ। উন্নত বিশ্বের অর্থনীতি যেখানে পতনের দিকে সেখানে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর অবস্থা অবর্ণনীয়। স্বল্প ও মধ্যম আয়ের দেশগুলো তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতেই হিমশিম খাচ্ছে। World Bank, IMF ও World Economic Forum এর মতে ২০২২ সালে বিশ্ব GDP প্রবৃদ্ধি ৪.৩% থেকে কমে ৩.২% হয়েছে এবং ২০২৩ সালে ২.৭% হবে । আর এ বৈশ্বিক প্রভাব বাংলাদেশেও পড়তে শুরু করেছে। ইতোমধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য থেকে শুরু করে সবকিছুর দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

বৈশ্বিক মন্দা

অর্থনীতির ক্ষতিকর প্রভাব যখন জাতীয় অর্থনীতিকে ছাড়িয়ে বিশ্ব অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে তখন তাকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রভাব বলে। আর এ প্রভাবের ফলে যদি সারাবিশ্বে সংকট দেখা দেয় তখন তাকে বলে মন্দা। সাধারণত বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি যদি ৩% এর নিচে নেমে আসে তবে তাকে বৈশ্বিক মন্দা বলে। বর্তমানে করোনা মহামারি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা ও বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রতিনিয়ত বিশ্ব অর্থনীতি সংকুচিত হচ্ছে। World Bank ও IMF ধারণা করছে ২০২৩ সালে সারা বিশ্ব মহামন্দার দিকে ধাবিত হবে। IMF বলছে এ মন্দা যত বেশি দীর্ঘায়িত হবে সারা বিশ্বে দারিদ্র্যের সংখ্যা তত বাড়বে।

বৈশ্বিক মহামন্দা

মন্দার কারণ

অর্থনীতি সচল থাকলে একটি দেশের সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম সচল থাকে। আর সে অর্থনীতি যদি ধীরগতির হয় কিংবা পতনের দিকে যায় তাহলে রাষ্ট্র পতনের দিকেই ধাবিত হয়। বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষেত্রেও একই রকম ধারা প্রবাহিত হয়। বিশ্বব্যাপী আজ যে মহামন্দা দেখা দিচ্ছে তার কারণের সাথে বাংলাদেশের প্রেক্ষিত কারণগুলোও তুলে ধরা হলো--

বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দার কারণ	বাংলাদেশে মন্দার কারণ
• কোভিডের কারণে উৎপাদন হ্রাস পাওয়া ও পণ্য সরবরাহ ব্যাহত হওয়া।	• কোভিডের কারণে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২৫-৩০% বৃদ্ধি পাওয়া।
• রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্ব খাদ্য প্রবাহ ৩০-৩৫% হ্রাস পাওয়া।	• রাশিয়ার উপর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে বাংলাদেশের শীর্ষ আমদানি পণ্য ভোজ্যতেল, গম, ভুট্টার দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
• রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকট ও জ্বালানির দাম দ্বিগুণ বৃদ্ধি।	• বিশ্ব জ্বালানির সাথে বাংলাদেশে পেট্রোল, ডিজেল, অকটেন, গ্যাস ইত্যাদির দাম দ্বিগুণ বৃদ্ধি।
• সারাবিশ্বে ডলারের সংকট দেখা দিয়েছে। যার কারণে আমদানি খরচ বহুগুণ বেড়ে গেছে।	• ডলার সংকটের কারণে টাকার মূল্যের পতন। ২০২০ সালে ১ ডলার সমান ছিল ৮৫ – ৮৬ টাকা যা বর্তমানে ১০৫ টাকাতে পৌঁছেছে।
• রাশিয়া, OPEC ও OPEC Plus এর জ্বালানি উৎপাদন কমিয়ে দেওয়া।	• আমদানিকৃত জ্বালানি নির্ভরশীল হওয়ায় কৃষি, শিল্প ও সেবাখাত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
• রাশিয়া হলো বিশ্বের শীর্ষ সার উৎপাদনকারী দেশ, বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে রাশিয়া সার রপ্তানি করতে পারছে না।	• পর্যাপ্ত পরিমাণ সার ও সেচের অভাবে কৃষি উৎপাদন মারাত্মকভাবে কমে যাচ্ছে।
• আমদানি রপ্তানির ব্যাপক তারতম্য।	• আমদানি খরচ বৃদ্ধি ও রপ্তানি হ্রাস পাওয়া।

বৈশ্বিক মহামন্দা

বৈশ্বিক মন্দার প্রভাব

বিশ্বব্যাপী মন্দা দেখা দেওয়ার ফলে যেসব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়বে--

বিশ্বব্যাপী	বাংলাদেশ
• World Bank, IMF ও World Economic Forum এর ধারণা মতে ২০২২ সালে বিশ্ব GDP প্রবৃদ্ধি ৪.৩% থেকে কমে ৩.২% হয়েছে এবং ২০২৩ সালে হবে ২.৭% ।	• বাংলাদেশের GDP প্রবৃদ্ধি ২০১৯-২০ সালে ছিল ৮.১% যা গত দুই বছরে কমে ৭% এর কাছাকাছি চলে এসেছে।
• সারাবিশ্বে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে যেমন: যুক্তরাষ্ট্রে- ৯%, ভারতে- ৭%, জিম্বাবুয়ে-২৫৫%, লেবানন-৩৫০%।	• বাংলাদেশে ২০২০-২১ সালে মূল্যস্ফীতি ছিল ৫.৬% IMF বলছে ২০২৩ সালে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি হবে ৯.১%।
• জ্বালানি খরচ বৃদ্ধি ও ডলার সংকটের কারণে সারা বিশ্বে আমদানি খরচ বেড়েছে।	• ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ বাড়লেও আমদানি খরচ আগের তুলনায় ৪৩% বেড়েছে।
• বৈশ্বিক এ মন্দার কারণে বিশ্বব্যাপী নতুন ভাবে দারিদ্র্য হবে আরো ২০% মানুষ।	• ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্য হার ১৫% নামিয়ে আনার কথা থাকলেও গত ২ বছরে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২০.৫% এ স্থির রয়েছে।
• যুদ্ধের কারণে বিশ্ব খাদ্য প্রবাহ ৩০-৩৬% হ্রাস পেয়েছে। ফলে বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে।	• খাদ্য সরবরাহে ঘাটতি ও আমদানি খরচ বৃদ্ধির কারণে দ্রব্যমূল্যের দাম দ্বিগুণ হয়েছে।
• বিশ্বের প্রতিটি দেশ সংকট মোকাবিলায় রিজার্ভ অর্থ থেকে ঘাটতি মেটাচ্ছে, ফলে প্রতিটি দেশে রিজার্ভ ঘাটতি দেখা দিয়েছে।	• ২০২০-২১ সালে বাংলাদেশের রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৪৮.০৪ বিলিয়ন ডলার। IMF এর মতে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রকৃত রিজার্ভ ২৭.৫ বিলিয়ন ডলার।

➲ অর্থনীতিবিদরা বলছেন, করোনা পরবর্তী মূল কাজ হবে অর্থনীতিকেই গুরুত্ব দেওয়া। কারণ অর্থনীতিকে কেন্দ্র করেই সুশাসন ও উন্নয়নের অন্য সূচকগুলো চালিত হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রতিটি খাত করোনাকালীন সময়ে মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে মোটা দাগে কৃষি, সেবা এবং শিল্পখাতে ভাগ করা হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, দেশের অর্থনীতিতে এখন সেবা খাতের অবদান প্রায় ৫১.৫৩ শতাংশ। এছাড়া শিল্প খাত ৩৪.৯৯ শতাংশ এবং কৃষির অবদান ১৩.৪৭ শতাংশের মতো। করোনা পরিস্থিতির জন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকায় সেবা খাত ও শিল্প খাত মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন।

১. আর্থিক ক্ষতিঃ

২. চাকরিচ্যুতঃ

COVID-19

৩. আয় কমা:

৪. বড় ব্যবসায় ধস:

৫. গার্মেন্টস কারখানায় প্রভাব

The Economic Impact of COVID-19

COVID-19

❖ **করোনা-পরবর্তী অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে করণীয়:** সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম ৪০ জন অর্থনীতিবিদের কাছে করোনা-পরবর্তী অর্থনীতি ও পুনরুদ্ধারে তাদের মতামত নিয়ে 'চিফ ইকোনমিস্ট আউটলুক' প্রকাশ করেছে। তারা বিভিন্ন দেশের জন্য তিনটি প্রধান উদীয়মান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করেছে। সেগুলো হলো-

ক. বৈষম্য হ্রাস ও সামাজিক গতিশীলতা বাড়াতে অর্থনৈতিক নীতিগুলো পুনর্বিবেচনা।

খ. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নতুন উৎস চিহ্নিত।

গ. অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতা বাড়াতে নতুন লক্ষ্যের ওপর মনোযোগ দেওয়া।

➲ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর আতিউর রহমানের মতে, অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের কৌশল হিসেবে তিনটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

➲ **প্রথমত,** মানুষের (জনশক্তি) ওপর বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। যারা পিরামিডের মতো নিচের দিকে আছে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে, টিকিয়ে রাখতে হবে।

➲ **দ্বিতীয়ত,** অর্থনীতির পুনরুদ্ধার হতে হবে আরও স্বচ্ছ ও স্থিতিস্থাপক।

➲ **তৃতীয়ত,** ডিজিটাল রূপান্তরে বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতিতে দেশে বিদেশি বিনিয়োগের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জাপান, চীনসহ বেশ কিছু দেশ থেকে বিনিয়োগ স্থানান্তর হচ্ছে। এসব বৈদেশিক বিনিয়োগে আকর্ষণ বাড়াতে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। ইতিমধ্যে সরকার বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ব্যাংক ব্যবস্থায় কিছু সংস্কারের ঘোষণা দিয়েছে। সে সুবিধাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কড়া নজরদারি প্রয়োজন হবে। এছাড়া বিনিয়োগ বাড়াতে করনীতিসহ জমি প্রাপ্তি সহজ করা অপরিহার্য।

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

✪ পূর্ব ইউরোপে বাংলাদেশি মানব সম্পদের একটি সম্ভাবনাময় শ্রমবাজার রয়েছে। এ সম্ভাবনাকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে সরকারকে উদ্দেশ্য করে একটি পরামর্শপত্র লিখুন। [৪৪তম বিসিএস লিখিত

✪ পৃথিবী কীভাবে সুনীল বা সমুদ্র অর্থনীতির ধারণার দিকে অগ্রসর হচ্ছে আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস লিখিত]

✪ রোহিঙ্গা সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করুন। [৪১তম বিসিএস লিখিত]

✪ রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশের গৃহীত নীতি ও পদক্ষেপ সারা বিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে এবং দেশের জন্য অনেক সুফল বয়ে আনছে। কিন্তু মিয়ানমার সরকারের আচরণের কোনো পরিবর্তন ঘটছে না। রোঙ্গিাদের ফিরেয়ে নেওয়ার ব্যাপারে কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখছে না। এ পরিস্থিতিতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রোহিঙ্গা বিষয়ে একটি উন্মুক্ত আলোচনায় বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই আলোচনায় অংশ নেবেন। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের জন্য একটি নীতিপত্র (policy brief) তৈরি করুন।

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

Best of Luck

shabbir.cce.buet@gmail.com

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি (https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

09666775566
www.uttoron.academy